একগুচ্ছ **ধারাবাহিক**

রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি

উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত

থ্রিলার। মরা মৌমাছির চোখ

বেড়ানো। বউ সাথে পথে পথে

নিয়মিত প্রতিবেদন

কবির কলমে। উত্তরের উপকথা

খুচরো ডুয়ার্স। সেরা পোস্ট। রাসায়নিক রস

গল্প। পাইনের পাহাড়ে আদুরে রোদ্দুরে

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

নভেম্বর ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

কমিউনিস্ট ১০০

নেহেরু ১৩০

গান্ধী ১৫০

মিস্টি কমলালেবু ডুয়ার্সের স্বাস্থ্য বদলে দিতে পারত

অসম্ভব কোনও কাহিনি নয়। প্রয়োজন ছিল শুধু একটি বলিষ্ঠ নীতি ও সদিচ্ছা। সিঙ্কোনার মতই চা বাগানের অভাব মেটাতে এগিয়ে আসতে পারত উত্তরের মিস্টি কমলালেবুর চাষ। কৃষি, উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এই তিন দপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উত্তর বাংলার পাহাড়ে ও ডুয়ার্সে বিশ্বমানের কমলালেবুর রেকর্ড উৎপাদন সহজেই হতে পারত।

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

বলি তো বটে, কিন্তু শোনেটা কে?

এ সময় সন্ধ্যা থেকে ভোর হিমেল চাদরে মুড়ে থাকে ডুয়ার্স। কুয়াশারা দখল নিতে শুরু করেছে হাইওয়ের। ভাইরাস প্রকোপে ঘরে ঘরে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ। হেমন্তের ধান পাকে, অন্ধকার ঘনালেই পটকা- প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ক্ষেতে ক্ষেতে হানা দেয় ক্ষুধার্ত হাতির পাল। সুখী মানুষেরা এসময় পরিবার নিয়ে পরিযায়ী হয়, ফেসবুকে উঠে আসে মোহিনী ল্যান্ডস্কেপ, কিন্নর করবেট কানহা কোদাইকানাল, শত শত লাইক আসলে প্রতিবেশি হৃদয়ে ঈর্ষা জাগায়। ক্যামেরা হাতে তরুণ পরিযায়ী পাখির অপেক্ষায়, পুজা সাহিত্য গড়াগড়ি খায় ড্রয়িংরুমের সোফায়।

ক্যালেন্ডার ধরে এই পর্যন্ত চলছে সব ঠিকঠাক। কিন্তু তারপরেই হিসেবে গরমিল ধরা পড়ে। যেখানে কর্মহীনতা আর মাদক নেশা দুই সর্বনাশা হাত ধরাধরি করে চলে। সন্ধে ঘনালে ঝুপড়িতে ঘুপচিতে মদ্যপানের বহর দেখে পুলিশও বোধহয় আজ ক্লান্তিবোধ করে। পান বিড়ির দোকানে গুটখার চাইতেও অনেক বেশি বিক্রি হয় প্লাস্টিকের গ্লাস আর ঠান্ডা জলের বোতল। নিম্নবিত্তের ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে কাফসিরাপ ট্যাবলেট ডেনড্রাইটের ভয়ংকর নেশা। উৎসবের জৌলুসের আড়ালে বিষাক্ত মাকড়সা জালে বুঁদ হয়ে আছে কৈশোর যৌবন। পরিত্রাণের পথ খুঁজে দিতে নেই কোনও নেতা দল বা স্বেচ্ছাসেবী। দেওয়ালে দেওয়ালে গোপনে নেশা ছাড়ানোর হলদে বিজ্ঞাপন শুধু দাঁত বের করে হাসে।

সত্যিই জীবন বড় পানসে এখন, কালিদা! অবাধ্য টোটোর মতই মন খারাপ অনায়াসে ঘুরঘুর করে নো এন্ট্রি জোনে। বিক্ষোভ নেই অবরোধ নেই চ্যালেঞ্জ নেই। অনুপ্রেরণা নেই, তাই উন্নয়ন নেই। সহিষ্ণুতা নেই, তাই সমালোচনা নেই। তার্কিক নেই, বিতর্কিত পোস্টে তাই লাইক নেই। থাকলেই যে বড় বিপদ, ঘর পরিবার মর্যাদা সব তছনছ হয়ে যেতে পারে রাতের অন্ধকারে। আছে শুধু সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রাজনীতির গভীর শলা আর গহীন ছলাকলা, যা বোঝার সাধ্য নেই কারো। কোনও ইজম নয়, যেনতেন ক্ষমতা আয়ত্তে রাখাই শেষ কথা জেনো হে বঙ্গ পুঙ্গবের দল, ইতিহাস সে কথাই বলে।

ডুয়ার্স নামের যাদু বাঙালি মননে আজও অটুট। তবে পর্যটনের স্বর্গরাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হিমালয়ের আশির্বাদ পুষ্ট এই বঙ্গ ভূমি আজও কিন্তু প্রস্তুত নয়, ইকো পর্যটনের জোয়ার সামলাতে গেলে যে পরিকাঠামো দরকার তা সম্পূর্ণ নয় আজও। ডুয়ার্স অরণ্যভূমিকে চিত্রায়িত করে দেশের নানা প্রান্তে বিজ্ঞাপিত করবার প্রয়াস আজও চোখে পড়ে কই? পাহাড়ের কল্যাণে পশ্চিমভাগে কিঞ্চিৎ আলো পড়লেও ডুয়ার্সের পূর্বভাগ আজও অন্ধকার। বাঘবনে বাঘ নেই, বনমন্ত্রীর রাগ নেই। জীববৈচিত্র্যের গৌরবগাথা থেকে যায় গবেষকের ডেস্কটপে, কোনও ফিলানথ্রপিক বা কর্পোরেট উদ্যোগ আসে নি আজও অর্থের আশ্বাস নিয়ে। চা বাগানকেও খরচের খাতায় ধরে রেখেছি আমরা, আদি জনজাতির শতসহস্র দরিদ্র মানুষ সে সবই বোঝে। মশাল কাঁধে নেওয়ার নেতৃত্ব নেই আমাদের, তাই শত আশার আলো জ্বালিয়েও কোচবিহার বিমানবন্দর সম্ভবত অগস্ত্য যাত্রার পথে, এক নেতামন্ত্রীদের ভাড়া করা পাখি বিমান বা কপ্টার নামার জন্যই জেগে থাকবে, হয়ত ফের ঝোপেঝাড়ে মুখ লুকোবে না। নামনি আসামের নির্মীয়মান রূপসি বিমান বন্দরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আজ আর উপায় নেই। ভাড়া গাড়ির তরুণ ড্রাইভার আজ সেই অসমিয়া পথেই গাড়ি চালাতে বেশি পছন্দ করে, কেন কে জানে!

এই নেই রাজ্যে তাই প্রশ্ন অনেক জাগে, কিন্তু সে সব জিজ্ঞাসা করবটা কাকে? ক্ষোভ জমে থাকে হপ্তা মাস ধরে, কিন্তু উগরাবো কার কাছে? সেইরকমই বলবার তো আছে অঢেল কথা, কিন্তু সে সব শুনতে আছে কি কেউ? যেমন বদ্যিকে রোগের কথা বলতে পারলে কষ্টের উপশম ঘটে অনেকটা! মনে পড়ল বহুকাল আগে খোদ বঙ্গেশ্বর আক্ষেপ করেছিলেন, কাজ করতে বলবটা কাকে? শূন্য চেয়ারকে?

যাক গে, আসন্ন শীতের মরসুমে নতুন শাকসব্জির স্বাদ উপভোগ করে ভাল থাকবার চেষ্টা করবেন।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৫৬৪৯৯৮৫৬১
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৩৮২৯৭৭৬২৯
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৭৮৬৪৯৯৫৫১৫
বালুরঘাট	
মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক	
বিশাল বুক সেন্টার	৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা

এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।

জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৬

উত্তরের উপকথা
বেশ্যাপাড়ার একটি গুজব ১৯

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
শতবর্ষে পৌঁছে কি ইতিহাসের কাছে ক্ষমা চাইবেন কমরেড? ১০
যে ধর্মনিরপেক্ষতায় গভীর আস্থা ছিল পণ্ডিত নেহেরুর ১২
পাহাড়ে বিপন্ন কমলালেবুর চাষ আশা জোগাতে পারে ডুয়ার্স ১৪
মহাত্মার জীবন ও দর্শন অপ্রিয় রয়ে গিয়েছে বাঙ্গালির কাছে! ১৬

কবির কলমে
উত্তম চৌধুরী ১৮

পর্যটন
চিসাং ২০

ধারাবাহিক কাহিনি
বউ সাথে পথে পথে ২২
তাজ্জব মহাভারত ২৩
মরা মৌমাছির চোখ ২৮

গল্প
পাইনের পাহাড়ে আদুরে রোদ্দুরে ৩২

শ্রীমতি ডুয়ার্স
দলিত ও সংখ্যালঘু নারীদের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে! ৩৪
সূর্য পত্নী সংজ্ঞা এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী ও প্রমিকার গল্প ৩৫
আমার মেয়েবেলা ৩৭

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ডুয়ার্স ৫
রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

সেরা পোস্ট

রসায়ন মেলা অত সোজা? আমি যদি একটু ছিটেল টাইপ হই তাহলে ধোপদুরস্ত মস্তিষ্কর একটি বন্ধুই আমার জন্য সহজ হবে। আমি যদি কুটিল টাইপ হই তাহলে একটু হাঁদা গোছের বন্ধুই আমার জন্য যথার্থ হবে। আমি যদি হেব্বি ধান্দাবাজ হই আমার চাতুরী ধরতে পারবে না এমন একজন মানুষই আমাকে শেষমেশ টিকিয়ে দেবে।

তবেই না সম্পর্কের মজা। এখন দেখি মানে এই হাওয়ায় আসা স্যোশাল মিডিয়ার বন্ধুরা বেশিরভাগই কেমন ভাল হওয়ার দৌড়ে নেমেছে। কাউকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই বাবা! কে কখন উপকারে আসে! কে কখন বাঁশ দিয়ে যায়! সেই কারণে দিদি গো! দাদা গো! এই আপাত আদুরে লব্জগুলো এসেছে। আরে অত গো গো করার কী আছে? সোজা কথাটা সোজা ভাবে বললেই তো হয়। এই সবার কাছে ভাল থাকার চাপটি ইদানীং সাহিত্যেও এসেছে। বেশিরভাগই জবাকুসুম তেলের মতো ফুলেল লেখা। আরে যে লেখা পাঠককে খোঁচা দেয় না, সমাজকে উত্যক্ত করে না। সে লেখায় কী ছাইপাঁশ হবে? এবারের নোবেলজয়ী পোলিশ লেখক পিটার হান্টকে অত্যন্ত বিতর্কিত লেখক। এ কথা অনেকেই জানি। নাটক, প্রবন্ধ, ফিচার সমস্ত লেখাতেই বিতর্ক তাঁর সঙ্গে থেকেছে। এমনকী ভ্রমণ কাহিনীতেও তিনি রাষ্ট্রকে খোঁচা দিয়েছেন।

যাইহোক বলছিলাম, এই যে বিতর্কে না জড়ানো, ভাল হওয়ার অবিমৃষ্য তাড়নায় যারা ভুগছেন, এটি এই বিপ্লবহীন, বৃত্তাকার সময়ের একটি ব্যাধি। যে মানুষটি অকপট, যে মানুষটি অপ্রিয় সত্যবাদী, কেন সে একটি কৃত্রিম ভাল হওয়ার চাপে বদলে যাবে? সমস্ত মানুষ একরকম হয়ে গেলে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই তো অর্থহীন।

শুধু দূর থেকে বন্ধুত্বের সমীকরণ স্থায়ী রাখার মতো ভন্ডামি আর কত কাল?

আজকাল আমাকে এইসব খুব ক্লান্ত করে। যে সময় মানুষকে ভেতর থেকে বেঁটে করে দেয় সেই সময়ের মতো অভিশপ্ত আর কিছু হয় না।

বুবুন চট্টোপাধ্যায়
২০ অক্টোবর ২০১৯

পরিচিত শিল্প মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনবিচ্ছিন্ন মাধ্যম সম্ভবত চিত্রকলা। ইন্টেলেকচুয়ালি অ্যাডভান্স হতে হতে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সাধারণ উৎসাহী মানুষের পক্ষেও আজ চিত্রের পরিভাষা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। ছোট বড় বিভিন্ন শহরে এই যে এত চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাতে ক'জন যান আর গেলেই বা ক'জন বোঝেন সে সব কাজ! চিত্রকররা নিজেদের কাজ নিজেরাই দেখেন। নিখাদ দর্শক কজন? অথচ রোববার সকালে আর্ট স্কুলে যাবার ধুম কিন্তু সর্বত্র। তারপর কোথায় যেন হারিয়ে যায় সব। যে ভাবে হারিয়ে গেছে শহুরে ইন্টেলেকচুয়াল আর্টের মধ্যে গ্রামীণ চিত্রকলা। চিত্রপ্রদর্শনী কখনও গ্রামে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না অথচ পটচিত্র, সরাচিত্রের মতো কতো শিল্প ছিল গ্রামের নিজস্ব চিত্রশিল্প। গ্রাম বিচ্ছিন্ন, সাধারণ মানুষ থেকে সরতে সরতে চিত্রশিল্প আজ সংখ্যালঘু। শিল্পীরা নিজেদের মেধা মনন চর্চা করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখান থেকে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়া প্রায় অসম্ভব। অথচ মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো শিল্পের স্থায়িত্ব যে বেশিদিন হতে পারে না। গুণগ্রাহীর সংখ্যা কমতে থাকলে একদিন তা বিস্মৃতির অতলে যেতে বাধ্য।

একই কথা কবিতার ক্ষেত্রেও। এক্সপেরিমেন্ট তো সব শিল্পের প্রাণ। এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া নতুন ফর্মের জন্ম হতে পারে না। কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কবিতা যতটা দূর পৌঁছে গেছে ততটা দূরে কি সাধারণ পাঠক পৌঁছাতে পেরেছে? তাহলে কি এমন দিন একদিন আসবে যখন কবিতা বহুদুর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখবে তার পেছনে কোনো পাঠক নেই! সেদিন কবি ও কবিতা কী করবে? তার শিল্পের বড়াই কার সামনে করবে? তখন কি একাকীত্বের জ্বালায় কবিতা আত্মহত্যা করতে চাইবে না!

চিত্র, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক এক্সপেরিমেন্টটা করবে কীসের বেসিসে? তাঁর সাধনা কি তবে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হওয়া? মানুষকে সাথে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট না হলে তার ফল কিন্তু হাতে নাতে। পাঠক দর্শকের সংখ্যা দিন দিন কমছে, তার দায় কি কেবল মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট? চিত্র, কবিতা, গদ্য, নাটকের তাহলে এত হা হুতাশ কেন? মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো শিল্প মাধ্যমই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। আধুনিক ফর্মের কিছু শব্দের জঞ্জাল কবিতা মানুষ যত না নিজের অজান্তে বলে ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশি সাবলীল তাঁর মনের কাছে থাকা কবিতার লাইনে। মানুষ সমস্ত মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও গান শোনে, গুনগুন করে গান গায়, বাঁশির সুরে মোহিত হয়— কেন না এগুলো এখনও মানুষের মনের খবর রাখার দায় এড়ায় নি। ইজেল-ক্যানভাস আটকে যাবে শহরের আর্ট গ্যালারির শূন্য কক্ষের অন্ধকারে, কিন্তু খিল তুলে দেওয়ালে নিজের খেয়ালখুশীতে আঁকা বাইসন আবহমানকাল ধরে ফোঁসফোঁস করে যাবেই মানুষের চেতনা ও ভালোবাসায়। বিচ্ছিন্ন শব্দ গেঁথে কবিতার তুমি যা খুশি সর্বনাশ করো মানুষের তাতে কিচ্ছু যায় আসবে না। মানুষ তোমাকে গালাগাল দেবে কবি বলে কিন্তু কবিতাকে ভালোবাসবে, যে কবিতা কোনো শব্দ অহংকারী কবি নয়, মানুষ লিখেছে।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ
২৫ অক্টোবর ২০১৯

আজ সেই মেয়েটির জন্মদিন। কাউকে ভালবেসে যে ছেড়ে চলে এসেছিল স্বদেশ স্বজন স্বভূমি।

এসে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল গুরুর দেশের জন্য। কী করে গুরুর দেশের কবি শিল্পী বিজ্ঞানভাবুক ভাল থাকবেন, সার্থক হবেন, সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াটাই ছিল তার ভালবাসা। আর শিক্ষা বিস্তার, আর জনসেবা। ভয়ঙ্কর প্লেগকে ভয় না পেয়ে সাফাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

গুরু সুবিচার করেন নি। বড় বকাবকি করতেন। যিনি বলেছিলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার...' তিনি নিবেদিতার উপর এত ক্ষুব্ধ হতেন কেন, আজ আর জানার উপায় নেই। গুরুর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘও পছন্দ করেন নি। প্রথম সুযোগেই দূর করে দিয়েছেন মেয়েটিকে।

স্বদেশ স্বজনের টান উপেক্ষা করে চলে আসা মেয়েটার এই বুঝি প্রাপ্য ছিল।

আজ জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

মৃদুল শ্রীমানী
২৮ অক্টোবর ২০১৯

খুচরো ডুয়ার্স

১

মায়ের পায়ে ধর্না দিয়ে
রব সারাক্ষণ,
মা যদি চায় ফুল ফুটে যায়
যা ফোটাতে চায় এ মন।

ইহা কবিশিরোমণি পুরন্দর ভাট রচিত শ্যামা সঙ্গীত। ডুয়ার্সে ঘোর কালি পূজা হইতেছে। যে যাহার মত কালী এবং পূজা ভাগ করিয়া ভক্তি প্র্যাকটিশ করিতেছে। মৃতপ্রায় ক্লাবগুলি পদ্মাসন করিতে সম্মত হইয়া আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ নতুন পূজা ঘোষণা করিয়াছে। কলিকাতা হইতে গীতবাদ্যকরের দল 'দুম দাম হুয়া হুয়া' যেমন গাইতেছে তেমনই 'টিং টুং মা মা' করিতেছে। কালীপূজায় পলিটিকাল কম্পিটিশন আসিয়াছে। দিনশেষে দেবী কালিকা কাহার মুন্ড হাতে লইয়া ঘুরিবেন তাহা একুশ আসিলে বুঝা যাইবে। বৈকুণ্ঠপুরে আবার মহাপাঠশালা দখল করিয়া পূজা করাকে কেন্দ্র করিয়া ভয়ানক বাকযুদ্ধ হইয়া গেছে। পাঠশালা প্রধান নাকি নিজের ক্ষেত্রে মহাশক্তির আরাধনার অনুমতি প্রদানে রাজি নন। কিন্তু সমস্যা হইল, পূজার পরিবর্তে শিক্ষাকে প্রশ্রয় দান করিলে পদ্মশিবির কহিবে, রাজ্যে হিন্দু বিপন্ন, দান না করিলে ভক্ত বলিবে 'ভোট দিব না'। এই শাঁখের করাত লইয়া আলিনগরের সুগন্ধিবাবু চাপে পড়িয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে এখন তাঁহার রাজত্ব নাই। নতুন রাজা রাধামাধব পুরাতন ঘাসফুলদের বারিসিঞ্চন করিয়া জাগাইয়াছেন। তাহাদের নেতা বীরাপ্পনবাবু এমন পূজা করিতেছে যে শুনিয়াই তাক লাগিবার যো। তাই সুগন্ধীবাবুর খুব চাপ হইয়াছিল।

২

আমার পটকা ফাটিল
তুবড়ি জ্বলিল
ধোঁয়া যে উড়িয়া যায় মা।

ইহা পুরন্দরবাবু অবিস্মরণীয় রচনা। ডুয়ার্সে দীপাবলীর রাত্রে পিলে চমকানিয়া পটকা না ফাটাইবার জন্য প্রশাসন যে উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই, এমন নহে। কিন্তু শিলিনগরে পাব্লিক নির্ঘাত কোনও মহাজাগতিক ভাইরাসের খপ্পরে পড়িয়াছিল। তাই দীপাবলীর বৈকাল হইতে এমন পটকা ফাটাইয়াছে যে প্রশাসন ভোম্বল হইয়া গিয়াছে। আমি তখন শিলিনগরে মহাতামাক সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। শব্দ শুনিয়া প্রথমে ভাবিলাম, চীন আক্রমণ করিয়াছে। তাহার পর ভাবিলাম, নগরের সর্বত্র হাতি ঢুকিয়াছে তাই পটকা ফাটাইয়া তাড়াইতেছে। তাহার পর দেখিলাম পাব্লিক এ বাড়ির ছাদ হইতে সেই বাড়িতে পটকা ছুঁড়িতেছে। কে জানি কহিল, ইহা এক প্রকার ক্রীড়া। পটকাপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। দেখিতে দেখিতে ঘন ধূম্রজালে শিলিনগরের আকাশ ঢাকিয়া গেল। আমি সেই ধূম্রে অতিরিক্ত কিছু ধূম্র মিশাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

৩

মায়ের পায়ের জবা লয়ে
ফুরিয়ে গেল ধন
হায় একটা জবা পাঁচ টাকা চায়
নাই রে কার্য নাই কারণ!

ইহা পুরন্দরের টাটকা শ্যামা সঙ্গীত। পাড়ার সুভেনিয়ার-এ ছাপা হইয়াছে। দীপাবলীর পূর্বে কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় জবাফুলের ঠান্ডা লাগিয়াছিল। তাহারা ভাল করিয়া ফুটে নাই। তাই অমাবস্যার বাজারে জবা মাগ্‌গি হইয়াছিল। ১০৮ খানি জবাফুল কিনিবার আশা ত্যাগ করিয়া একটি ফুল কিনিয়া কলিকা সমিতির ঘরে প্রবেশ করিতেই সদস্যরা সমস্বরে কহিল, এ কী! মাত্র একখানি ফুল? আমি কহিলাম, সরকার বলিয়াছে চাইনিজ মাল খরিদ না করিতে। জবা হইল চায়না রোজ। ইহা মেড ইন চায়না। তাই একের বেশি কেনা যায় না।

৪

চোরের বউ

এইবার একখানি সত্য অণুগল্প বলি। ময়নাগুড়িতে এক চোর ঠিক করিল মোবাইল টাওয়ারে উঠিয়া তার চুরি করিবে। যথাকালে সে চুপি চুপি টাওয়ারে উঠিয়া যত্ন করিয়া তার কাটিল। তাহার পর টাওয়ারের পাটাতনে বসিয়া দেখিল মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ। চমৎকার বাতাস। মশা নাই। চোর নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজিল কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইবে বলিয়া। তারপর চোখ খুলিয়া দেখিল আকাশে সূর্য। মাটিতে মেলা লোক তাঁহাকে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে। চোর ভয় পাইয়া বউকে ফোন করিয়া কহিল, ওগো! ধরা পড়িয়াছি। শুনিয়া বউ এই মারে তো সেই মারে। যাহা হউক! দমকল আসিয়া বিস্তর কসরৎ করিয়া চোরকে নামাইল টাওয়ার হইতে। পুলিশ তাহাকে ধরিল। চোরের বউ থানায় আসিয়া চোরকে কহিতে লাগিল, লজ্জা করে না! এর আগে কতবার ধরা পড়েছ! একটাও চুরি ঠিকঠাক করতে পারো নি। প্রত্যেকবার তোমাকে ছাড়িয়েছি! তাহার পর জমা হওয়া লোকজনকে চোখ মুছিয়া কহিল, ভাবি আর ছাড়াব না। কিন্তু মনটা কেমন করে— !

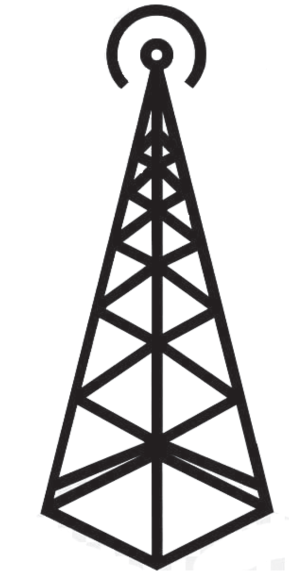

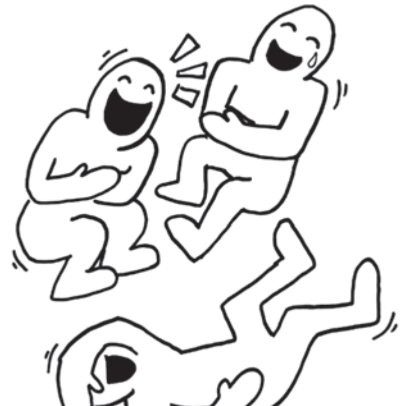

টুক্রাণু

ক) ইশ! মূর্তির নদীর জলে কারা জানি ফের ঢালিয়াছে বিষ!

খ) বাগ্রাকোটে ছিল হাতি, ছিল পরিত্যক্ত কুয়া। যে আছিল হাতি কূপে পড়িয়াছিল উহা।

গ) বারবিশায় ভাল খবর, মহা কলরব। পূজায় হইল শিশু চলচ্চিত্র উৎসব।

ঘ) মহাদিদি পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। বলিছেন রাসে তিনি ফের আসিবেন।

ঙ) শ্যামাপুজা, কত থিম, দেখি রহি রহি। কোথা বা ধূসর মরু, কোথা ভিনগ্রহী।

চ) মানিগঞ্জে বিলি হৈল মুরগির ছানা। যাঁরা পেল তাঁরা শাসকের চেনাজানা।

কলম সিং

সার্জন রেনী'র

'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

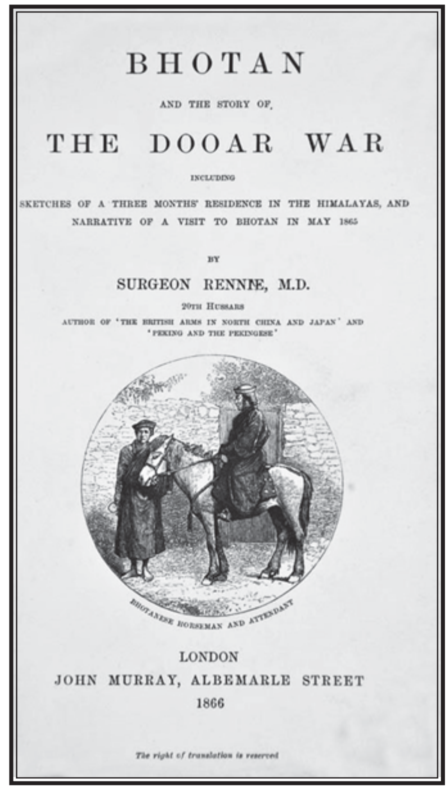
BHOTAN

AND THE STORY OF

THE DOOAR WAR

INCLUDING

SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865

BY

SURGEON RENNIE, M.D.

20TH HUSSARS

AUTHOR OF 'THE BRITISH ARMS IN NORTH CHINA AND JAPAN' AND 'PEKING AND THE PEKINGESE'

BHOTANESE HORSEMAN AND ATTENDANT

LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET

1866

The right of translation is reserved

সেসময় ভারতে ব্রিটিশবাহিনিতে কর্মরত এক মিলিটারি সার্জন চারমাসের ছুটিতে দেশে ফিরেছিলেন। ভুটান নামক আজব দেশটির কথা ইওরোপের মানুষকে জানানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর। ব্যস লিখে ফেললেন একটা বই। সার্জন রেনীর 'ভুটান এন্ড দ্য স্টোরি অব্ দ্য ডুয়ার ওয়ার' বইটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আজকের আগ্রহী বাংলাভাষীদের সুবিধার্থে এবং জনপদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের তাগিদে ওই সুবিশাল গ্রন্থটি আক্ষরিক অনুবাদে নয়, ভাবানুবাদে মনস্ক পাঠকের দরবারে নিবেদিত হল, ধারাবাহিক হিসেবে।

ভুটান যাত্রার প্রস্তুতি

১৮৬৩ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে মি. অ্যাসলে ইডেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সীমান্ত এলাকার ব্রিটিশদের হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলের ঘাঁটি দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছালেন। এসেই তিনি মিশনের মালবহন ব্যবস্থার জন্য কুলি, ঘোড়া ইত্যাদি সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠলেন।

মিশনের অর্থাৎ প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা ছয় জন। বাংলার সেনাবাহিনীর সদস্য ক্যাপ্টেন গডউইন অস্টিন ওই মিশনে ছিলেন সহকারী দূত এবং আমিন। একই সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ল্যান্স ছিলেন মিশনের কমান্ডার অর্থাৎ অধিনায়ক ও রক্ষক। বাংলার সেনাবাহিনীর ডা. সিম্পসন ছিলেন চিকিৎসক। তিব্বতি দোভাষীর দায়িত্বে ছিলেন ছেবু লামা। অ-চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী বিভাগের মি. পাওয়ারকে বিশেষ কাজের জন্য এবং মি. ইডেনের সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। এছাড়া সেবুন্দি বাহিনীর একশ'জন লোক ছিলেন। ওই লোকেদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শিখ নিরাপত্তা কর্মী এবং পঞ্চাশ জন রাস্তাঘাট ইত্যাদি কাজের নির্মাণ কর্মী।

দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখলেও ভুটানরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনও চিঠিপত্র বা নির্দেশিকা পাওয়া যায়নি। বাংলার লে. গভর্নর গত ১০ই সেপ্টেম্বরে ভুটানরাজকে একটি মিশন পাঠানোর অভিপ্রায়টি জানিয়েছিলেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, কয়েকজন ভুটানি আধিকারিককে যেন তিস্তা নদীর (দার্জিলিং সংলগ্ন) তীরে পাঠানো হয়। ওঁরাই মিশনকে পথ দেখিয়ে ভুটানের রাজধানী পুনাখায় পৌঁছে দেবেন।

দার্জিলিং থেকে গত ১০ই নভেম্বর মি. ইডেন নিজেও ভুটান সরকারকে একটি চিঠি পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি মিশনকে নিয়ে ভুটানে যাচ্ছেন। ভুটানি প্রশাসন যেন ডালিমকোটের জুঙ্পেনকে সীমান্তে তাঁর সাথে দেখা করবার নির্দেশ দেন। ওই জুঙ্পেন যেন ইডেনকে প্রয়োজনীয় লটবহর ও ক্যাম্প স্থাপনাদি বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেন। যদি জুঙ্পেন তা না করেন, তবে তিনি ভারত সরকারকে ওই অসহযোগিতার কথা জানাতে বাধ্য হবেন। আর সেটা হবে বন্ধুত্ববিহীন মনোভাবের পরিচায়ক।

ওই চিঠি পাঠানোর কিছুদিন পরেই মি. ইডেন জানতে পারলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভুটানে ওই সময়ে সর্বজনমান্য কোনও প্রশাসন নেই। কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া বিক্ষোভ-বিদ্রোহে গোটা দেশটাই এক অনিশ্চয়তায় ভুগে অরাজক হয়ে উঠেছে। পুনাখার জুঙ্পেন ভুটানের দেবরাজার নিকট থেকে মর্যাদা ও পদোন্নতির একটা প্রতিশ্রুতি জোর করে আদায় করে নিয়েছিলেন। ভুটানের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তাসিসু জঙ্-এ যখন একটা মারাত্মক সমস্যা দেবরাজের আসন্ন বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল, তখন ওই জুঙ্পেন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আর, ওই সহায়তা প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে যেন পেনলোর পদে উন্নীত করা হয় এবং লোভনীয় আন্দু ফোরাঙ্ দুর্গের আধিকারিক করে দেওয়া হয়।

অবশ্য সমস্যার মেঘ কেটে গেলে দেবরাজ তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি অন্য একজনকে ওই পদটিতে নিযুক্ত করেছিলেন। পুনাখার জুঙ্পেন সেই বঞ্চনায় মর্মাহত হন। রাজধানী যখন তাসিসু জঙ্ থেকে পুনরায় শীতকালীন রাজধানী পুনাখায় ফিরে আসে, তখন তিনি আচমকা দেবরাজের সব অনুচরকে দুর্গপ্রাসাদের কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং দেবরাজকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মনোনীত একজনকে দেবরাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। সিংহাসনচ্যুত দেবরাজা সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে ভুটানের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তাসিসু জঙ্-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই সময়ে ভুটানের দেবরাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন পশ্চিম ভুটানের পারোর পেনলো।

এ ঘটনায় পুনাখার জুঙ্পেন পূর্ব ভুটানে ক্ষমতা বিস্তারের প্রত্যাশায় টঙ্সোর পেনলোর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। শুধু তিনিই নন, পারোর পেনলো ছাড়া মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্যই ওই কূটচক্রে সামিল হয়েছিলেন।

রাজবিদ্রোহীরা তাসিসু জঙ্ ঘিরে ফেলে ও জলসরবরাহ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ওরা ওই রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনসম্পদ লুট করে নিয়েছিল। দুর্গের সঞ্চিত অর্থ শীঘ্র শেষ হয়ে গেলে দেবরাজার অনুগামীরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ভুটানের দেবরাজাকে বাকি জীবন নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা করবার জন্য সিমতোকা মঠে (মনাস্ট্রি) পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

দেশের অভ্যন্তরে যখন এরূপ বিদ্রোহত্মক ঘটনাগুলো ঘটছিল, সামান্য আকারে হলেও ব্রিটিশ ভারত সীমান্ত অঞ্চলে সামান্য হলেও, তার একটা প্রভাব পড়তে থাকে। সেটির নেতৃত্ব দিতে থাকেন ডালিমকোটের জুঙ্পেন। ওই ভদ্রলোক ভুটানের মন্ত্রীপরিষদের এক সদস্যের অনুগামী ছিলেন এবং অন্যত্র বিদ্রোহী কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে মদত দিচ্ছিলেন। কিন্তু, তিনি তো পারোর পেনলোর অধীনস্থ একজন পদাধিকারী। পেনলো তাঁকে ডালিমকোটের দুর্গ ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে একদল সেনা পাঠিয়ে তাঁকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্গ ছাড়লেও অবরোধ

চলতে থাকায় এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দখলকারীরা যখন শুনলেন যে, মি. ইডেনের মিশন সেখানে আসছে, তখন তারা ওই দুর্গটিকে দখলমুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মি. ইডেন যাত্রারম্ভের জন্য দার্জিলিং-এ অপেক্ষা করছিলেন। ওই সময়ে ডালিমকোটের জুঙ্পেন তাঁকে জানান যে, ভুটান সরকার ব্রিটিশ সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে ভুটানে সাদরে বরণ করতে অনিচ্ছুক নন। কিন্তু দেশের অরাজক অবস্থার কারণে এবং মিশনের সদস্যদের অভ্যর্থনা জানানোর বন্দোবস্ত করতে দেরি হওয়ার কারণে প্রাপ্ত পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটেছে। তাই তিনি একই পত্রে মি. ইডেনকে আরও কিছুদিন শান্তভাবে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতানুসারে কমিশনকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

নভেম্বরের শেষে ওই জুঙ্পেন কমিশনের সদস্য ছেবু লামাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে, দেশের কেন্দ্রস্থলে কীভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে, তা তিনি বুঝিয়ে বলবেন।

তিস্তা নদীর পাড়ে ছেবু লামার সঙ্গে ডালিমকোটের জুঙ্পেনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কয়েকদিন ধরে উভয়ে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। জুঙ্পেনের একটা সুপ্ত অভিপ্রায় ছিল, মি. ইডেন যেন তাঁর সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। তিনি সুনিবিড় বন্ধুত্বের ভান করে জানিয়েছিলেন যে, যদি দেবরাজা কিংবা ধর্মরাজার উদ্দেশে লেখা চিঠির জবাব মি. ইডেন ১০ই নভেম্বরের মধ্যে না পান, তাহলে পর্যাপ্ত উপঢৌকন পেলে তিনি মিশনকে ভুটানে প্রবেশে সাহায্য করতে রাজি আছেন। তবে, তিনি এ ইঙ্গিতও দিতে ভোলেন নি যে, তাঁর কথামত কাজ না করলে মিশনটি ভুটান সরকারের বিরাগভাজন হবে।

মি. ইডেন সমস্ত ঘটনা ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার উইলিয়াম ড্যানিসন (স্থায়ীপদে এসেছিলেন স্যার জন লরেন্স) লিখেছিলেন— যেহেতু সফল বিদ্রোহের পর একটি স্থায়ী সরকার কার্যভার গ্রহণ করেছে এবং যেহেতু ডালিমকোটের জুঙ্পেন আপনাকে সহায়তা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, তাহলে মিশনের আর যাত্রা শুরু করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। ভারত সরকার সব দেখেশুনে যা মনে করছে, দেরি করলে, নতুন দেবরাজা ভারত সরকারের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী এবং নিজেকেও শক্তিশালী একটা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।

এই চিঠি পাওয়ার পর মি. ইডেন যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ডালিমকোটের জুঙ্পেনকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি শিগ্গিরই যাত্রা শুরু করবেন। তাই তিনি জুঙ্পেনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, কয়েকজন লোক যেন তিস্তা নদীর ধারে তাঁকে সহযোগিতা করবার জন্য উপস্থিত থাকেন।

মালবহনকারী লোক সংগ্রহে নানা সমস্যা দেখা দিলেও মি. ইডেন ওই সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের কুলিরা ভুটানের ভিতরে ঢুকতে রাজি ছিল না। কারণ, সেখানকার অধিবাসীরা অন্য পার্বত্য জাতির লোকেদের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তবে, ছেবু লামার সহায়তায় একদল কুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, ১৮৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি যাত্রা শুরু হবে এবং কুলিরা মিশনের মালপত্র বহন করে নিয়ে যাবে।

কিন্তু, মিশন রওনা দিল ৪ঠা জানুয়ারিতে এবং কুলিরাও সেদিন ২২ মাইল পথ অতিক্রম করে তিস্তা নদীর তীরে এসে হাজির হয়েছিল।

স্থানটি দার্জিলিং থেকে ৬০০০ ফুট নিচে অবস্থিত। সেখানে কুলিদের একটা বড় অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভুটানে ঢোকার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রেও মি. ইডেনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন লামা। তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকে কুলি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সিকিমের রাজা ছেবু লামাকে পার্বত্য অঞ্চলে একটা জোত দান করেছিলেন। তাই কুলি সংগ্রহ করতে স্থানীয় জোতদারের অসুবিধে হয়নি। তবে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তিস্তা নদীতে বাঁশের সাঁকো বানিয়ে ওপারে ভুটানের ভূমিতে প্রবেশ করা হয়েছিল। সেখানে গড়ে উঠেছিল তাঁদের ক্যাম্প (শিবির)।

কালিম্পং ঃ ইডেনের দলটি ওই শিবির থেকে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে শুরু করলেন। ভুটানের পার্বত্যভূমি অতিক্রম করতে করতে তাঁরা সমুদ্রতট থেকে ৩,৭৩৩ ফুট উপরে কালিম্পং নামে পার্বত্য ছোট্ট একটি জনপদে এসে হাজির হয়েছিলেন। মি. ইডেনের বর্ণনায়, এখানে আমাদের একটা দিন থাকতে হয়েছিল। কারণ, বারবার স্থান ত্যাগের কারণে জিনিসপত্র ওলট-পালট হয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল বলে কুলিদের ডেকে এনে বোঝাতে হয়েছিল। এখানে থাকাকালীন আমরা কয়েকটা গ্রাম ঘুরে দেখেছিলাম। অধিবাসীরা আমাদের দেখে দারুণ উৎসাহিত হচ্ছিল। ওরা আমাদের ডিম, মুরগি, কমলালেবু ও শাকসবজি এনে উপহার দিচ্ছিল। দেশের এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি এবং স্থানটি কৃষিকাজের বেশ উপযোগী। আমাদের সীমান্ত থেকে এই গ্রামগুলি কাছে হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাদের গ্রাম প্রধানদের মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধবাহিনীতে ঢুকতে উৎসাহিত হচ্ছিল। বাকি লোকেরা ভুটান সরকারের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মালবহনের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছিল।

সেখানকার অধিবাসীরা তীব্রভাবে তাদের নিজেদের (ভুটান) সরকারকে গালিগালাজ করছিলেন এবং দার্জিলিং-এ আমাদের শাসনব্যবস্থার দারুণ প্রশংসা করছিলেন। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, তাদেরকেও যেন আমাদের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রায় সব বাড়িরই কিছু লোক আমাদের শাসিত এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণ করেছেন।

আমরা পাশ্ববর্তী একটি বৌদ্ধমঠ দেখতে গিয়েছিলাম। তখন মঠের লামা মঠের বাইরে ছিলেন। দু'জন ভিক্ষুণী আমাদের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখালেন। ওই দু'জন ভিক্ষুণী আমাদেরকে ইংল্যান্ডের দুটি জলপাত্র দেখিয়ে বললেন যে, পবিত্র আধার রূপে ওই জলপাত্র দুটি পূজার বেদীতে স্থাপন করা হয়েছে। অন্য দেশে এরূপ পানপাত্র ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মঠটির চারপাশে কমলালেবুর প্রচুর ঝোপ বেশ সুন্দর লাগছিল। কিন্তু লামাদের ভয়ে সেখানকার লোকেরা ওই কমলালেবুগুলি বিক্রি করত না। অবশ্য বেচাকেনা করতে অনভ্যস্ত লোকেদের টাকাপয়সা দেখতে লামাদের ভয় কেটে গেল। এরপর তারা শুধু কমলালেবু বিক্রিই করল না, আমাদেরকে প্রচুর কমলালেবু দিয়েও গেল।'

ধুমসুঙ্ ঃ কালিম্পং-এ মি. ইডেন এক অভদ্র আধিকারিকের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি ধুমসুঙে র প্রাক্তন নেবু। মি. ইডেনের বক্তব্য, 'এদেশে সব জায়গাতেই দু'জন করে আধিকারিক নিযুক্ত থাকেন— এক জনের হাতে ক্ষমতা থাকে, অন্যজন থাকেন ক্ষমতার বাইরে।' প্রাক্তন নেবু প্রথমে মি. ইডেনকে ওই দেশের ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডালিমকোট যাবার পথ দেখাবার জন্য একজন পথপ্রদর্শকও দিয়েছিলেন।

৯ই জানুয়ারিতে দীর্ঘ পথ চলার পর দলটি পৌঁছায় পাইগঙ্-এ। ওই পথ চলার সময়ে কুলিদের একটা অংশ লটবহর ফেলে পালিয়ে যায়। ফলে, প্রচুর মালপত্র গ্রামবাসীদের বাড়িতে গচ্ছিত রেখে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

এখানে একটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন মি. ইডেন। গচ্ছিত মালপত্রের মধ্যে একবাক্স কার্বলিক সাবানও ছিল। পরদিন প্রতিনিধিদল সেটির খোঁজ করলে গ্রামবাসীরা জানায় যে, এখানে কোনও জিনিস চুরি যায়নি। কিন্তু পুনাখা থেকে ফেরার পথে জানা যায় যে, গ্রামবাসীরা ওই সাবানকে পশুখাদ্য মনে করে খাইয়েছিল এবং ফলে সাতটি প্রাণী মারা গিয়েছিল।

পরের দিন পাইগঙ্ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে ধুমসুঙ্ দুর্গে পৌঁছায় দলটি। ধুমসুঙ্ দুর্গটি মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি চতুর্ভুজাকার। পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় একটা উঁচু বাঁধের মত স্থানে, সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্তী তিস্তা উপত্যকায়, সেটি অবস্থিত। মি. ইডেনের বর্ণনায় জানা যায়—

'চুলহা, নিতাই ও উখলা গিরিপথের বরফ সমাচ্ছন্ন স্থানগুলি এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমাদের তিন দিকে নেপাল, ভুটান ও সিকিমের বরফ ঢাকা বিভিন্ন পর্বতশ্রেণি অবস্থিত। আমরা মাত্র ষোল মাইল দূর থেকে তিব্বত, সিকিম, ভুটান ও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন সিকিম— এই চারটি দেশকে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এ দৃশ্য সত্যিই সুন্দর। দার্জিলিংও এখান থেকে দৃশ্যমান। এর নিচেই সিকিমের রেণকের অপূর্ব সুন্দর উর্বর উপত্যকা। আমরা বহুদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিব্বতের গিরিপথের ওই রাস্তা যেটি দার্জিলিং সীমান্তের রংগীত নদী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। ওই পথ ধরেই তিব্বতি ব্যবসায়ীরা বছরান্তে একবার দার্জিলিং-এ ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে থাকেন।'

ধুমসুঙ্ দুর্গের আধিকারিককে অসভ্য বলে বর্ণনা করে মি. ইডেন বলেন, তিনি ওই দুর্গে ঢুকতে চাইলে, ওই আধিকারিক উদ্ধতভাবে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

লাভা ঃ ১১ই জানুয়ারিতে প্রতিনিধি দল ৬,৬২০ ফুট উচ্চতায় লাভা নামক পর্বতের চূড়ায় এসে পৌঁছেছিলেন। পরের দিন ধাপে ধাপে দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে এক তীব্র স্রোতস্বিনীর তীরে হাজির হয়েছিলেন।

চেল, ধরলা ঃ যদিও ওই স্রোতস্বিনীকে মি. ইডেন

ধরলা নদীর একটি শাখা বলে বর্ণনা করেছিলেন, সার্জেন রেণী পরবর্তীকালের যাত্রাপথে জানান যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে চেল নদী। সেখানে হাজির হলে ডালিমকোট দুর্গের জুঙ্পেনের পাঠানো একটি দল তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। জুঙ্পেন কয়েকটি টাট্টু ঘোড়া ও খচ্চর পাঠিয়েছিলেন। ওই দেশের প্রথা অনুযায়ী সেগুলি উপঢৌকন। ওই বাহনগুলির পিঠে চড়তে গিয়ে মিশনের কয়েকজনের মজার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। ওই উঁচু এবং রাগী ঘোড়াগুলোকে জিন পরাতে কিংবা অস্থির ও অবাধ্য খচ্চরের পিঠে চড়তে— কেউ স্বস্তি ভোগ করেনি।

অম্বাইক, ডালিমকোট ঃ মিশন এবার চেল নদীর ক্ষেত্রভূমি থেকে নিচে নেমে আসতে লাগলেন। নাচা-গানা দলের কোলাহল, রূপোলি বাঁশির একঘেয়েমি সুরে, পেতলের করতালের শব্দে ওই দেশের জাতীয় সঙ্গীতে— সকলে অস্থিত হয়ে উঠেছিলেন। এভাবে শুনতে শুনতে দলটি ডামিলকোটের নিচে ২,৯২২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত অম্বাইক নামক স্থানে উপনীত হয়েছিল। এই অভ্যর্থনার সময়ে কিন্তু সারাদিন ধরে দেশিয় গোলাবর্ষণ (ধুমসি) অর্থাৎ আগুনের গোলা ছুটতেই থাকে।

মিশনকে একইভাবে অভ্যর্থনা চলাকালীন বহিরঙ্গে বন্ধুত্বের অদ্ভুত বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। মি. ইডেন কিন্তু দলের সঙ্গীসাথীদের চাল সরবরাহের জন্য জুঙ্পেনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। জুঙ্পেনও পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে দিতে রাজি। কিন্তু তিনি জানালেন যে, যদি মণ (৮০ পাউন্ড) প্রতি সাত টাকা (১৪ শিলিং) চাল কেনার জন্য তাকে অগ্রিম দেওয়া না হয়, তবে তিনি তা সংগ্রহ করে দিতে পারবেন না। অবশ্য পরবর্তীকালে যথাসময়ে জানা গিয়েছিল, যে এলাকা থেকে তিনি চাল সংগ্রহ করেছিলেন, সেখানকার স্থানীয় বাজারদর ছিল মণ প্রতি দশ আনা অর্থাৎ মাত্র ১৫ পেনী।

জুঙ্পেন মহোদয় ১৪ই জানুয়ারিতে তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য মি. ইডেনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিনও তাঁর সঙ্গে ছিল ২০০ জন বিশৃঙ্খল অনুগামী। কেউ বা গায়ক ও বাদক, কেউ বা বারুদ ভর্তি গোলা ফাটানোর লোক আবার কয়েকজন হাড্ডাগোড্ডা বাহক। ওই বাহকেরা কাঠের উপর ধর্মীয় বাণী খোদাই করা বোর্ডগুলি কাঁধে নিয়েছিল। যে জনজাতি থেকে ভুটানি জাতির উদ্ভব, ওই জনজাতির প্রথাগুলি তাঁরা এখনও মেনে চলেছেন। চিন দেশেও যে কোনও অনুষ্ঠানে পদমর্যদা অনুসারে মান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার সময়েও একই ধরনের লিপি খোদাই করা কাঠের বোর্ড মিছিলে থাকে।

সেদিনের সাক্ষাৎকার ও তার ফলাফলের বর্ণনা অ্যাসলে ইডেনের বিবরণে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ক্যাম্পে ধীর গতিতে এগিয়ে আসা গোটা দলটি প্রতি ২০ গজ অন্তর থেমে থেমে ধ্বনি দিতে থাকে। সাধারণভাবে শুনলে মনে হয় যে, একদল শিয়াল যেন চিৎকার করছে। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার সময়ে এমন ধ্বনি দেওয়া হয়ে থাকে। যতক্ষণ ওই চিৎকার চেঁচামেচি চলছিল, তারই মধ্যে জুঙ্পেন মাথা ঝুঁকিয়ে নিজেকে মর্যাদাপূর্ণ সাব্যস্ত করছিলেন। আমি অন্যান্য অনুষ্ঠানেও একই সংস্কার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এটিকে আমি ওদের পুরনো প্রথা ছাড়া অন্য কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না।'

আমার তাঁবুতে ঢোকার সময়ে জুঙ্পেনকে তাঁর অনুগামীরা পা দুটি ধরে চ্যাংদোলা করে তুলে শূন্যে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকিয়েছিল। ভাবখানা দেখে মনে হয়েছিল, পায়ে হেঁটে তাঁবুতে ঢোকা তাঁর মত লোকের কাছে অমর্যাদাকর। অনুষ্ঠানটি যতই জম্পেশ হোক না কেন, সম্ভ্রান্তরীতি থেকে তা ছিল বহু দূরে। জুঙ্পেন ওই চ্যাংদোলায় যে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, তা সবাইকে গালিগালাজ করতে করতে আমার আসবার সময়ে উপলব্ধি হয়েছিল।

জুঙ্পেন লোকটি ছিলেন মোটাসোটা, কুৎসিৎ দর্শন, গেঁয়ো, অশিক্ষিত। তিনি যখন বসলেন, তখন তাঁকে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কপট গাম্ভীর্য তিনি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি। তিনি ব্র্যান্ডি চেয়ে বসেছিলেন। তাঁকে ব্র্যান্ডি দেওয়া হলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বাচাল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, তিনি কতটা মদ খেতে পারেন। তিনি বার বার মদ চাইতে থাকলে, তাঁর মাতলামি শুরু হলে, ইডেন সাহেব তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা মাতলামি করেই চলেছিলেন এবং শেষে বিরক্ত অনুচরেরা তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সাহেবের অসন্তুষ্টির কথা তারাও বুঝতে পেরেছিল। এ ঘটনার পর তিনি আর সেখানে আসার জন্য চাপাচাপি করেননি। সেখান থেকে বেরিয়ে ছেবু লামার তাঁবুতে বসেও তিনি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলেন ও বিকেলবেলা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু চলে যাবার সময়ে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, দেখা গেল, যে কুলিরা টাকা নিয়েও কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাদেরকে বেত মারতে মারতে ফিরিয়ে আনছিল তাঁর অনুচরেরা। জুঙ্পেন বার বার ক্যাপ্টেন ল্যান্স ও ডা. সিম্পসনকে অনুরোধ করতে লাগলেন, তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সাহেবদ্বয় জানিয়েছিলেন যে মি. ইডেনের অনুমতি ছাড়া এভাবে কুলিরা চলে যেতে পারে না।

এরপর জুঙ্পেন খাপ থেকে ছোরা বের করে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ইডেন কমিশনে কর্তব্যরত এক রক্ষীকে কেটে ফেলার হুমকি দিয়েইছলেন। চারদিকে তখন প্রচণ্ড গন্ডগোল, কোলাহল। কমিশনের রক্ষীবাহিনী তাদের দিকে ছুটে গিয়ে খালি হাতেই তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন। এতে জুঙ্পেন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ইডেন সাহেব ওই জুঙ্পেনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ তিনি লিখিতভাবে ইডেন সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, ততক্ষণ তিনি আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। অবশ্য জুঙ্পেন লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

কুলিদের যে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, তা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা মি. ইডেনের কাছে ছিল ধোঁয়াশাগ্রস্ত। যাত্রা শুরু থেকেই কুলিদের মনে অসন্তোষ ও ভয় দানা বেঁধে ছিল। তাদেরকে চাপ দিয়েই কাজ করানো হচ্ছিল। কেউ কেউ পালিয়েও গিয়েছিল। জুঙ্পেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হয়ত তাদেরকে আরও বেশি ভীত করে তুলেছিল।

ডালিমকোট বা সন্নিহিত গ্রামগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করা একান্তভাবে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কারণ, বহু লোক সেদিন ক্যাম্পে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল।

এ অবস্থায় মি. ইডেন তাঁর সহকর্মী ক্যাপ্টেন অস্টিনকে ডুয়ার্সের ভেতর দিয়ে সীমান্তবর্তী স্টেশন জলপাইগুড়িতে চাল কেনার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

চাল কেনার জন্য অপেক্ষার অবসরে মি. ইডেন ভুটানের দেবরাজার একটি চিঠি পেয়েছিলেন। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে তিনি যেন জুঙ্পেনকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝিয়ে দেন। মি. ইডেন দেবরাজার সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন, ওই কাজে জুঙ্পেন সহযোগিতা করবেন।

ডালিমকোটে জুঙ্পেনকে ডেকে মি. ইডেন কমিশনের উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝিয়ে দিলে, জুঙ্পেন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তবে তিনি ইডেনের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন যে, অগ্রবর্তী গমনপথ নিয়ে তিনি উদ্‌বিগ্ন। অবশ্য মিশনের সাফল্যের সঙ্গে তাঁরও স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তিনি জানিয়েছিলেন যে, আমবাড়ি-ফালাকাটাসহ ডুয়ার্সের কর্তৃত্বে আছেন তিনি। ফলে ওই জনপদের রাজস্ব বিষয়ে একটা সমাধানসূত্র প্রয়োজন। তবে, তিনি আরও জানান, দেবরাজার স্পষ্ট সম্মতিসূচক পত্র না পেলে মি. ইডেনের আর এগিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ, দেবরাজা হয়ত ভেবেছেন যে, মি. ইডেন তখনও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাতেই আছেন। জুঙ্পেন অবশ্য ভুটান সরকারের কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকেন। তিনি নাকি দেবরাজার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মিশন ডালিমকোট এলে তিনি কী করবেন! জুঙ্পেন নাকি এমন ছলনাময় উত্তরও পেয়েছিলেন যে, মিশনের আসা ও চলে যাওয়ার জন্য তিনিই দায়ী।

জুঙ্পেন বিনীতভাবে জানান যে, তাঁকে বলা হয়েছিল, ভারতের গভর্নর জেনারেল কেন একদল সৈন্য ভুটানে পাঠাচ্ছেন, তা দেবরাজার বোধগম্য হচ্ছিল না। দেবরাজার মতে, ভুটানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হয়ত কিছু অভিযোগ আছে। তিনি অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবেন। সমাধান করতে সময় তো লাগবেই। এ জন্যে অসন্তুষ্ট হওয়া কাম্য নয়।

মি. ইডেন দেবরাজার চিঠির প্রত্যুত্তরে স্পষ্টভাবে জানান যে, যে ঘটনার সঙ্গে ভুটান সরকারের সর্বোচ্চ আধিকারিকেরা যুক্ত, ডালিমকোটের জুঙ্পেন নন। তিনি দেবরাজার কাছে স্পষ্টভাবে জানতে চান, মি. ইডেনকে তিনি সাদরে বরণ করবেন কি না। যদি দেবরাজার সিদ্ধান্ত নঞ্চর্থক হয়, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে যাবেন এবং ভারত সরকারকে বিষয়টি জানাবেন।

কুলিদের বেত্রাঘাত করা, চাপ সৃষ্টি করা কোনও সুফল প্রদান করেনি। বিপরীতভাবে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। মি. ইডেন লিখেছিলেন, 'ডালিমকোটের দুর্গের আধিকারিকের সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়াটা এক অসম্ভব কাজ। কারণ, নেপালি ও সিকিমের কুলিরা আমাদের কাছে অনেক প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। আমরা তাদের বোঝা কমিয়ে দিলেও অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করার জন্য কুলি দরকার। আবার কুলিদের খাবারের উপযোগী চাল বহন করে নিয়ে যাওয়াটা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি

করেছে।’

মি. ইডেন ডালিমকোটের কাছে অমবয়কে চাল জমা রাখার জন্য একটা বড় গুদামঘর তৈরি করেছিলেন। প্রয়োজনে সেখান থেকে চাল নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তবুও, প্রত্যেক কুলির কাঁধে এক-আধ মণ চাল বহন করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় কুলি সংগৃহীত হলে, ওরা স্থানীয়ভাবে চাল সংগ্রহ করতে পারত এবং জুঙ্‌পেনও সরকারি কর্মী কিন্তু একাজে ব্যর্থ হওয়া অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছেন। এই সংকটকালে ক্যাপ্টেন অস্টেন জলপাইগুড়ি থেকে প্রয়োজনীয় চাল সংগ্রহ করে, লোকজনসহ ডালিমকোটের পথে রওনা দেবার সংবাদ জানালে, কিছুটা স্বস্তি দেখা দেয়।

মি. ইডেন এবার ডালিমকোটের জুঙ্‌পেনকে মনস্থির করতে বললেন। হয় তিনি মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন, নতুবা মিশনের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ঝুঁকি ও দায়িত্ব গ্রহণ করুন। জুঙ্‌পেনকে কিছু টাকাপয়সা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি পর্যাপ্ত কুলি সংগ্রহ করতে না পারার কারণে ও গুদাম ঘরের মালপত্রের দায়িত্ব গ্রহণে রাজি না হলে, কমিশন দিশাহীন হয়ে ওঠে।

ক্যাপ্টেন অস্টেন ২৯ শে জানুয়ারিতে ফিরে এলে, মিশনের বেশিরভাগ মালপত্র, খাদ্যসম্ভার গুদামঘরে মজুদ রেখে, স্থানীয় এক আধিকারিক সুবেদারের তত্ত্বাবধানে রেখে মিশন ওই স্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পঞ্চাশ জন শিখ সেনা ও কয়েকজন রাস্তাঘাট নির্মাণ কর্মীর রসদ বহনের সিদ্ধান্ত হয়।

ডালিমকোট ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে মি. ইডেন আবার জুঙ্‌পেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জুঙ্‌পেন ভাল ব্যবহার করেছিলেন। জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর বাড়ির লাগোয়া একটি মনাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার লামারা মিশনের নিরাপদ যাত্রার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রার্থনাও করেছিলেন।

সিপছু ঃ ডালিমকোট থেকে মিশন প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথ ধরে চার মাইল অতিক্রম করে ১৫০০ ফুট নিচে নেমে পাহাড়ি ছোট ঝরনা সুকিয়া-ছু পেরিয়ে এক সমতলে এসে পৌঁছেছিল। ওই নদীর তটেই ছিল ডালিমকোট দুর্গ। মিশন সেখানেই রাত কাটিয়েছিল। স্থানটি ম্যালেরিয়া প্রবণ এবং আপাতদৃষ্টিতে হাতিদের খাবার সংগ্রহকারী ক্ষেত্র।

পরের দিন ১১ মাইল রাস্তা গভীর বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে মাঝ পথে নুর-ছু নামে একটা বড় নদী পেরিয়ে মিশন ছয় মাইল দূরে ছোট্ট নদী মোছু’র পারে সেদিনকার মত রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল। ওই নদীতে ছিল প্রচুর মাছ এবং নদীর পারের বনভূমিটি ছিল নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র।

ওই বনভূমির ভেতর দিয়ে ছিল পরের দিনের যাত্রাপথ। সেদিনকার রাত কাটাবার জন্য সিপছু নামক এক জনপদ। ডে-ছু নামের এক প্রবল স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে সিপছুতে পৌঁছাতে হয়েছিল। ডে-ছু নদীর তীরে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল। কারণ, মিশন যাতে নদীটি পেরোতে না পারে সেজন্য নদীর সেতুটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ের উঁচুতলে কাঠের একটি খাঁড়া সেতু তৈরি করে ১৫০০ ফুট নিচে নেমে ওপারে যেতে হয়েছিল।

ওই স্থানে মত্ত অবস্থায় কয়েকজন ভুটানি আধিকারিক মি. ইডেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারা জানালেন যে, কাছাকাছি একটা দুর্গ আছে। ওই দুর্গটি সবসময় লোকজনে ভর্তি থাকে। ওঁরা অনুরোধ করেন যে, ওই দুর্গের এক মাইলের মধ্যে মিশন যেন কোনও ক্যাম্প না করেন। কারণ, ভয়ে ওই দুর্গের সৈনিকেরা এগিয়ে এসে আক্রমণ করতে পারে।

মি. ইডেন কিন্তু ওই আধিকারিকদের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মত্ত আধিকারিকদের সব কথাই কল্পনাপ্রসূত। গোটা সিপছুতে মাত্র একটাই কাঠের বাড়ি। ওই বাড়িতে তিন-চারটি গোয়াল ঘর ছিল। ওই বাড়িতে মাত্র কয়েকজন নরনারী বসবাস করে থাকে।

মি. ইডেন লিখেছেন, ‘যে লোকেরা সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাদের নেতার নাম ছিল মিম্‌বা কাজী। ওই লোকটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বহু বছর চাকরি করেছিলেন। তিনি দার্জিলিঙের আদালতে ভুটিয়া ভাষার অনুবাদকের কাজ করতেন। উনি ডা. ক্যাম্বেলের ডান হাত হিসেবে বহুদিন কাজ করেছিলেন। ১৮৫১ সালে ডা. ক্যাম্বেল ও স্যার যোশেফ ডাল্টন হুকারকে যখন সিকিমরাজ বন্দি করেছিলেন, ওই সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মিম্‌বা কাজী। ডা. হুকারের ‘হিমালয়ান জার্নাল’-এর ২৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ওই বন্দিদশা থেকে কোনওভাবে পালিয়ে লোকটি দার্জিলিং-এ চলে এসেছিলেন। ওই সময়ে দুই পায়ে কয়েক পাউন্ডের লোহার বেড়ি পরা অবস্থাতেও তিনি তিস্তা নদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন।

১৮৬০ সালের শেষদিকে ডা. ক্যাম্বেল যখন পুনরায় সিকিমে গিয়েছিলেন, ওই সময়েও তাঁর সঙ্গী ছিলেন মিম্‌বা কাজী। তাঁর ব্যবহার ছিল চমৎকার। অসম সাহসিকতার জন্য তিনি বেশ কয়েকবার সম্মানিতও হয়েছিলেন। ১৮৬১ সালে আমি (মি. ইডেন) যখন সিকিম-ব্রিটিশ সম্পর্ক দেখভালের দায়িত্ব ডা. ক্যাম্বেলের হাত থেকে গ্রহণ করেছিলাম, ওই সময়েও মিম্‌বা কাজী একজন সহকারী ও গুপ্তচর হিসেবে আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু লোকটি আমার সঙ্গে এক সপ্তাহের বেশি সময় থাকেননি। লোকটি শত্রুপক্ষীয় লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছিল এবং আমি সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমি তাঁকে নজরে রাখছি। ওই দিনই লোকটি সীমান্ত পেরিয়ে ভুটানে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য পালানোর সময়ে তিনি সঙ্গে ৬০/৭০ ঘরের মত প্রজা, গবাদি পশু, অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছিলেন।

এর পরবর্তীকালে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, লোকটি ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে সিকিমিদের ও ভুটিয়াদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

দার্জিলিং-এ তাঁর এক জমিদারী (এস্টেট) ছিল, ব্রিটিশ সরকার ওই এস্টেটটি অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল। ইডেন জানান, ‘বর্তমানে সেখানে ‘মিম্‌বা কাজী টি প্ল্যান্টেশন’ নামে একটি ইউরোপীয়ান চা-বাগান গড়ে উঠেছে।’

ইডেন সাহেবের ধারণা, ডালিমকোটের জুঙ্‌পেন হওয়ার জন্য মিম্‌বা কাজী পারোর পেনলোকে দু’হাজার টাকা সেলামি দিয়ে চেয়েছিল। কিন্তু ওই টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পেনলো মহোদয় তাকে নিরাশ করেননি। আর, টাকা হাতে পাওয়ার পর পেনলো তাকে একজন বেসরকারি সৈনিকের পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি যেদিন ইডেন সাহেবের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেদিন উনি এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যে, উনি বহাল তবিয়তে আছেন।

উনি ইডেন সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন, তাকে যদি একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেবার এবং দার্জিলিং-এ ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে তিনি মিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। উনি ক্যাম্পে যোগদান করলেও ইডেন সাহেব তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। লোকটি কিন্তু সাহায্য করতেই থাকেন।

যে কুলিরা ডালিমকোট থেকে সিপছু পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে আসতে রাজি হয়েছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল যে সিপছু একটা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সেখানে কুলি সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। কিন্তু সেটা ছিল অভিসন্ধিমূলক মিথ্যা ভাষণ। এখন এখানে কুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলে সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল।

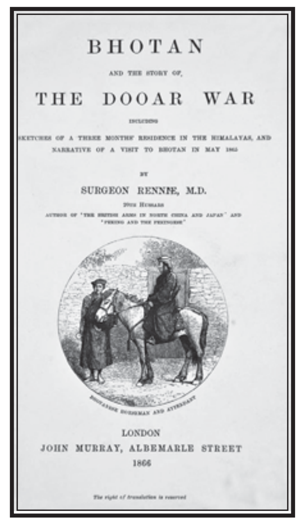
BHOTAN
AND THE STORY OF
THE DOOAR WAR
INCLUDING
SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865
BY
SURGEON RENNIE, M.D.
LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET
1866

সিপছু জেলার প্রাক্তন নেইবু পরের দিন মি. ইডেনের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে কোনও সাহায্যই করতে পারবেন না। কারণ, মিশনটি সন্দেহাতীত ভাবেই ভুটান সরকারের অনুমতি ছাড়াই সেখানে এসে পড়েছে। সরকারের নিকট থেকে তিনি কোনও নির্দেশপত্র পাননি। কিন্তু মিশনটি যদি সিপছুতেই কয়েক সপ্তাহ কাটাতে পারে, তবে হয়ত নির্দেশিকা আসলেও আসতে পারে। আদেশ পেলে অবশ্য কুলি পাবার কোনও সমস্যা থাকবে না। ভদ্রলোক বিষয়টিকে এমনভাবে উত্থাপন করেছিলেন যে, সেখানে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। কারণ, তিনি তো আর কোনও সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে রাজি নন। কিন্তু মি. ইডেন সবকিছু শুনে নিজের এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্তই বজায় রেখেছিলেন।

তবে, এগিয়ে যেতে হলে মি. ইডেনকে মালপত্র ও রক্ষীবাহিনী কমাতে হবে। বোগ্‌ল, টার্নার, পেম্বারটন যেমন সামান্য সংখ্যক পরিচারক নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, তাঁকেও ওই পথ ধরতে হবে। মাত্র ১৫ জন শিখ সৈন্য এবং সেবুন্দিকে নিয়ে তিনি যাবেন। সঙ্গে থাকবেন সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত আধিকারিক মি. পাওয়ার, সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট, অনুবাদক ও করণিকের কাছে নিযুক্ত মুন্সী, একজন চিকিৎসক এবং সামান্য কয়েকজন মানুষ।

(আগামী সংখ্যায়)

শতবর্ষে পৌঁছে কি ইতিহাসের কাছে ক্ষমা চাইবেন কমরেড?

জয়ন্ত গুহ

এই নভেম্বরেই জন্ম পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর। এই নভেম্বরেই সোভিয়েত বিপ্লব। দুইই আজ সুদূর ইতিহাস। তবু নেহরু এবং সোভিয়েত রাশিয়ার কথা এলে যে প্রসঙ্গ অবধারিত আসবেই তা হল এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির বিস্তার। নেহেরু প্রবর্তিত ‘মডারেট’ কংগ্রেসের হাত ধরে গ্রেট ব্রিটেন রাশিয়া ও চীনের কম্যুনিস্টরা কী সুচারু উপায়ে এদেশে পসার বাড়িয়েছিলেন— দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সে নিয়েই গবেষণা করছেন নয়া প্রজন্মের ঐতিহাসিকরা। দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী ও কম্যুনিস্ট আনুকূল্যে লেখা ইতিহাসের গভীর আস্তরণ ভেদ করে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সত্য সামনে আসবেই। কিন্তু আপাতত যেটুকু দাবি করা যায় তা হল, নেহরু এবং তাঁদের ‘পরম বন্ধু’ কম্যুনিস্টরা বরাবরই বিদেশ বা বিদেশী ভক্ত। ব্যক্তি, শিক্ষা এবং আদর্শ— সবকিছুতেই তাঁদের এক অমোঘ ‘ফোরেন’ আকর্ষণ আছে। সেই অদৃশ্য টানেই সম্ভবত, নভেম্বর বিপ্লবের গন্ধ মেখে সিপিএম-ও তড়িঘড়ি ঘোষণা করেছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিরও শতবর্ষ। যদিও কম্যুনিস্ট পঞ্জিকায় মতান্তর আছে। ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত’ মতে সিপিআই-র এতে আপত্তি আছে। তাঁদের মতে শতবর্ষ পালনের সময় এখনও হয় নাই। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে লীন হয়ে যাওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির মতই সিপিএম-ও আপ্রাণ চাইছে শতবর্ষকে কেন্দ্র করে তাদের সংগঠনকে বাঁচিয়ে তুলতে, একুশের বঙ্গ নির্বাচনে পায়ের তলায় কিঞ্চিৎ জমি খুঁজে পেতে। স্রেফ কাগজে কলমে বেঁচে থাকা সিপিআইয়ের হিসেব মানতে গেলে যে দেরি হয়ে যাবে। সুতরাং এবারই কম্যুনিস্টদের একশো বছর। একশো বছরতো কম কথা নয়। এই একশো বছরে কম্যুনিস্টরা মানুষকে কী কী দিল তা জানতে নতুন প্রজন্মের পাঠকের আগ্রহ থাকবে বলাই বাহুল্য।

১৯৪৭-এ, মুসলিম লীগের নেতা জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব মানে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকে কেন্দ্র করে যখন দেশভাগ হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তখন নিশ্চিতভাবেই আমাদের পশ্চিমবাংলাও চলে যাচ্ছিল পাকিস্তানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যদি না রুখে দাঁড়াতেন তাহলে এই বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। শ্যামাপ্রসাদ-কে সেদিন প্রবল সমর্থন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেল। আর মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কম্যুনিস্টরা সেদিন কী বলেছিলেন?

১৯৪২ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান গঙ্গাধর অধিকারী'র দলিলে (অধিকারী থিসিস) পাকিস্তান গঠনকে সমর্থন করা হয় এবং পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। “পাকিস্তানের দাবী মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে,” এই ছিল তখন কম্যুনিস্টদের স্লোগান।

১৯৪৭-এ, মুসলিম লীগের নেতা জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব মানে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকে কেন্দ্র করে যখন দেশভাগ হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তখন নিশ্চিতভাবেই আমাদের পশ্চিমবাংলাও চলে যাচ্ছিল পাকিস্তানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যদি না রুখে দাঁড়াতেন তাহলে এই বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। শ্যামাপ্রসাদ-কে সেদিন প্রবল সমর্থন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেল। আর মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কম্যুনিস্টরা সেদিন কী বলেছিলেন?

মুসলিম লীগের প্রস্তাবই ছিল, হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। এই রকম প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে আসবেন, তা স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে, একথা কম্যুনিস্টদের অজানা ছিল না। কিন্তু তাহলে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কম্যুনিস্টরা কি সহৃদয় ছিল? উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁরা কতখানি সহানুভূতিশীল ছিলেন তা প্রমাণ করে, কম্যুনিস্ট শাসনকালে মরিচঝাপিতে অসহায় উদ্বাস্তুদের নির্মম গণহত্যা। কী আশ্চর্য, এই নির্মম গণহত্যার পর সুশীল সমাজ কি মুখ বুঁজে থেকেছে?

সবাই বোধহয় নয়। বাংলাভাগ নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি জিন্নার পক্ষে থাকলেও বিভূতিভূষণ থেকে আম্বেদকর মুখ খুলেছেন বাংলাভাগের পক্ষে। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গ স্থাপনের পরপরই, কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫শে জুন একটি চিঠিতে লিখেছেন, “নতুন বঙ্গ ভাগ হয়ে গেল, ভালই হল। বাঙালী হিন্দুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে”। এমনকি বাবাসাহেব আম্বেদকরও বলছেন (বাংলা তর্জমা), “শরিয়া আইন অনুসারে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত — দার-উল-ইসলাম (ইসলামী ভূমি) এবং দার-উল-হারব (যুদ্ধভূমি)। যে দেশ মুসলমানেরা শাসন করে, তাকে বলা হয় দার-উল-ইসলাম। যতক্ষণ মুসলমানেরা কোনও দেশের বাসিন্দা কিন্তু সে দেশের শাসক নয়, ততক্ষণ সে দেশ দার-উল-হারব”।

বাংলা ভাগের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্য মোট ৭৬টি সভা হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র ১২টির আয়োজক ছিল হিন্দু মহাসভা এবং ৫৯টি সভার আয়োজক ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস। ৫টি সভা

আয়োজিত হয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভার যৌথ প্রচেষ্টায়। সবচেয়ে বড় সভাটি হয় কলকাতায়। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের পৌরোহিত্যে। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহাও সেদিন বাংলাভাগের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ডাকে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন প্রখ্যাত সব ব্যক্তিত্ব। কম্যুনিস্ট পার্টির পাকিস্তান লাইনের বিরুদ্ধে সেদিন জোরালো সওয়াল করেছিলেন, ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। দলিত নেতাদের মধ্যে বাংলার প্রাক্তন তফশিলী মন্ত্রী শ্রী প্রেমহরি বর্মণ এবং মতুয়া মহাসংঘের প্রধান শ্রী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরও বাংলাভাগের পক্ষে জোরালো আহ্বান জানান। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি হেঁটেছিল অন্যপথে। জনমতের বিরুদ্ধে। বাংলার বিরুদ্ধে। কম্যুনিস্ট পার্টির পাকিস্তান লাইন শুধু তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকে নি। গণনাট্যের কম্যুনিস্ট কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পার্টি লাইনের সমর্থনে লিখছেন,—

শোন কংগ্রেস নেতাগণ
মুসলমানের আত্মশাসন
না মানিলে হয় না মিলন
দেখ চিন্তা করি।

জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রস্তাবের পক্ষে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাষাতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস কম্যুনিস্ট পার্টির হয়ে লিখলেন—

দীন ইসলামের নিদমহলে হাঁকে ভোরের আজান
জাগ জাগ রে মুসলমান।

আসলে কথা ছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুটি পাকিস্তান হবে। একটা 'পশ্চিম পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে— পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। আর একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান'— স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতায় মুসলিম লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় কম্যুনিস্ট পার্টি। আসলে তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন, একটি সিপিপি (কম্যুনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান) হবে। সিপিআই দেশবিভাগের সমর্থনে ১৯৪৩ সালে যে মানচিত্র প্রকাশ করেছিল তাতে জলপাইগুড়ি জেলা সহ মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর জেলাকে পাকিস্তানে রাখা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ না থাকলে, জলপাইগুড়িকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল, কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

স্বাধীনতার আগে উত্তরবঙ্গ বলতে ছিল রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং। কোচবিহার তখন ছিল দেশীয় করদমিত্র রাজ্য। ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যা ছিল ১০,৮৯,৫১৩, বর্ণহিন্দু— ২,২৬,৯৪৩, তপশিলী হিন্দু— ৩,২৫,৫০৪, মুসলমান— ২,৫১,৪৬০ এবং অন্যান্য বা প্রকৃতি উপাসক— ১৫,৩০০। স্বাভাবিকভাবেই জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাসের ধর্মভিত্তিক কাঠামো মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' হওয়ার পথকে সুগম করে দেয়। জলপাইগুড়ির প্রভাবশালী নবাব মোশারফ হোসেন দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন, মুসলিম লীগের। জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানায় মুসলিম লীগ। শ্রদ্ধেয় নেতা পাখি ঘটক, বাদল সরকার, ঘনশ্যাম মিশ্র এবং অনিলধর গুহনিয়োগী-র মত মানুষজনরা থাকলেও মোশারফ হোসেনের প্রতিপত্তি খর্ব করার মত শক্তি কারও ছিল না। আর কম্যুনিস্টরা তখন উঠে পড়ে লেগেছেন জলপাইগুড়িকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ-এর তথ্য অনুযায়ী, "হিন্দু মহাসভার জন্মলগ্ন থেকেই

সিপিআই দেশবিভাগের সমর্থনে ১৯৪৩ সালে যে মানচিত্র প্রকাশ করেছিল তাতে জলপাইগুড়ি জেলা সহ মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর জেলাকে পাকিস্তানে রাখা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ না থাকলে, জলপাইগুড়িকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল, কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

জলপাইগুড়ি জেলা ও সদর শহরে দলের সাংগঠনিক কাঠামো বেশ শক্তিশালী ছিল। ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে সাঁওতাল-ওঁরাও উপজাতির সংখ্যা জলপাইগুড়িতে কম ছিল না। 'প্রকৃতি পূজারী' হিসেবে তাঁদের দেখানোয় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ বিষয়টিতে নজর দেন। চা বাগান অঞ্চলে ওঁরাও জনজাতি ও সাঁওতালদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে, 'সত্যম শিবম' ধর্মীয় চিন্তার প্রচার শুরু করেন জেলার বিশিষ্ট জননেতা শ্রী কাশীশ্বর চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একাংশও এই জনজাতিসমূহ, বিশেষ করে— রাভা, কোচ, পালিয়া-মোরঙ, চুতিয়া-মেচ, গাড়ো, টোটো প্রভৃতিদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন"। যদিও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতারা এই ভাবনার সঙ্গে একমত ছিলেন না। স্বভাবতই জেলার কংগ্রেস নেতারা যারা 'হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন' তাঁদের কংগ্রেস থেকে শো-কজ করা হয়।

১১ জানুয়ারি ১৯৩১, জাতীয় কংগ্রেস আদমশুমারি বয়কটের ডাক দেয়। প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলার নেতারা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে 'হিন্দু মহাসভা' তে যোগ দেন। পদত্যাগ করেছিলেন জেলা কংগ্রেসের কর্ণধার শ্রী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রী শ্রীনাথ হোড়, প্রখ্যাত কবিরাজ শ্রী সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী। সবাই মিলে একসঙ্গে, প্রকৃতি উপাসকদের 'হিন্দু' হিসাবে আদমশুমারিতে উল্লেখ করার জন্য আন্দোলনে নামেন এবং সফল হন। জলপাইগুড়ি জেলা বেঁচে যায় কম্যুনিস্টদের চক্রান্ত থেকে। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি থেকে বেঁচে যায় জলপাইগুড়ি। বেঁচে যায় 'নিজভূমে ভিনদেশী' হয়ে যাওয়ার এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার হাত থেকে।

মনে পড়ে 'গণনায়ক' গল্পে রাজবংশী পুরোহিতের সেই যন্ত্রণাময় জিজ্ঞাসা! "বাপ পিতামহ'র আমল থেকে আমরা রয়েছি— পাকিস্তানে চলে গেলেই হল?" সোশ্যালিস্ট নেতা-ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' লেখা হয়েছিল তেঁতুলিয়ার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপটে। দেশভাগের সময় তেঁতুলিয়া সহ জলপাইগুড়ির পাঁচটি থানা চলে গিয়েছিল পাকিস্তানে।

এ যন্ত্রণার খবর কি রাখে 'বিপ্লবের পতাকা বহনকারী' সিপিএম? দলের ১০০ বছরে দাঁড়িয়ে কী উত্তর দেবে সিপিএম? সিপিএম গান্ধিজিকে সমালোচনা করেছে বিপ্লবের পরিপন্থী বলে। আর বাংলায় "সুশাসন এবং উন্নয়ন"-এর নামে, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জনবিপ্লবের কণ্ঠরোধ করেছে, মরিচঝাঁপি এবং নন্দীগ্রামে। কেন ২০০৮ সালে জঙ্গলমহলের ১৫০০ মানুষকে জেলে যেতে হয়েছিল? কেন জঙ্গলমহলের প্রায় ৫০০ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সিপিএমের এলাকা দখলের লড়াইয়ে? দলের শতবর্ষে সিপিএম কি ঢাকতে পারবে নেতাই বা নানুরে হত্যালীলার আর্তনাদ? মানুষ যদি আপনাদের প্রশ্ন করে, "কংগ্রেস এবং জনসঙ্ঘ-বিজেপির শিকড় নিঃসন্দেহে ভারতীয়। আর আপনারা"? চিন আর রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মডেল কপি করে চলা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে এর কোনও উত্তর নেই। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা কি 'ধর্মনিরপেক্ষ'? প্রশ্ন উঠবে, ধর্মের ভিত্তিতে যারা জিন্নার পাকিস্তান লাইনকে সমর্থন করেছিল তাঁদের কি নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে দাবি করা উচিত? শিক্ষা থেকে ইংরাজি তুলে দিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে সিপিএমের দলীয় সিন্ডিকেট তৈরি করা নয় শুধু, দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন বামপন্থী ঐতিহাসিকরা। কী জবাব দেবেন বামপন্থী ঐতিহাসিকরা, যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন আপনারা অনুশীলন সমিতির ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসেননি? কে এবং কোন লবি বারবার কণ্ঠরোধ করেছিল ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের? রাসবিহারী বসু কেন আসেনি বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের গবেষণায়? সিস্টার নিবেদিতা এবং অরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত ক্ষুদিরাম বসু এবং আর এক বিপ্লবী বাঘাযতীন-কে নিয়ে কেন অবহেলা করেছেন বামপন্থী ঐতিহাসিকরা?

উত্তর চাইছে সময়। শতবর্ষে দাঁড়িয়ে এ উত্তর দিতে হবে বামপন্থীদের। এদেশের মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করার আগে বামপন্থীদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত গোটা দেশের কাছে, মানবিকতার স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

যে ধর্মনিরপেক্ষতায় গভীর আস্থা ছিল পণ্ডিত নেহেরুর

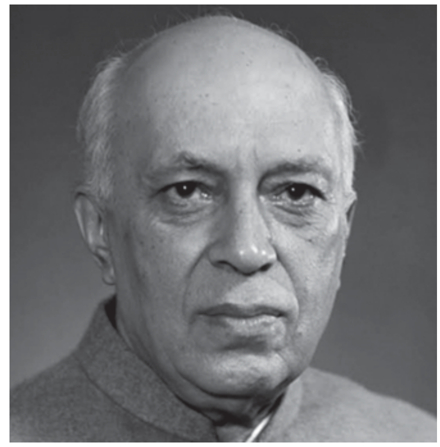

নেহেরু ১৩০

দেবপ্রসাদ রায়

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস যে প্রচারপত্রটি প্রকাশ করে তাতে লেখা ছিল, "একটি স্থায়ী ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নতিশীল রাষ্ট্র গঠনের জন্য কংগ্রেসকে ভোট দিন।" পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই শ্লোগানটির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের প্রধান প্রচারক হিসেবে, তাঁর ছবিও পোস্টারটিতে মুদ্রিত ছিল।

পণ্ডিত নেহেরু বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম সমন্বিত একটি দেশে কেবলমাত্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন স্থায়ী সরকার উপহার দিতে সক্ষম। ধর্মনিরপেক্ষ শাসন সার্বিক উন্নতিশীলতার পথকেও গতিশীল করে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটির ব্যাখ্যায় পণ্ডিত নেহেরু চারটি শর্তের কথা বলেছেন—

১) রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে না।

২) ধর্ম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবে না।

৩) সহিষ্ণুতা।

৪) সর্ব ধর্মের সমান সুযোগ ও অধিকার।

উপরের চারটি উপাদানের মধ্যে সহিষ্ণুতা, ভারতবর্ষের মত একটি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে এবং প্রসার ঘটাতে নির্ণায়ক শক্তি বলা যায়। কারণ যদিও ভারতবর্ষ বহু ধর্ম সমন্বিত দেশ, কিন্তু দেশের ৮২ শতাংশ মানুষ একটি ধর্ম, হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। সত্যিই চিন্তার কারণ এই যে, দেশের সংখ্যাগুরু অংশ ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কতদিন সংখ্যালঘু ধর্মীয় মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে!

পণ্ডিত নেহেরু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার সমর্থক ছিলেন। সেই কারণে তাঁর উন্নয়নকামী মনন জনজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তাঁর মতে, মানুষ তার ব্যক্তিগত আত্মোন্নতির জন্য একান্তে ধর্মাচার পালন করতেই পারে। কিন্তু সংগঠিত ধর্মাচার প্রায়শই উন্নয়নের বিরোধিতা করে। তাঁর দূরদৃষ্টি কতটা প্রখর ছিল তা আজকের শবরীমালা অধ্যায়ে দেশের মানুষের কাছে প্রত্যয়মান। যখন সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী প্রগতিশীল রায়ের বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিকামী রাজ্য কেরালার একাংশ মানুষের নখদন্ত প্রদর্শিত বিরোধিতা, (যার সর্বাগ্রে ছিলেন মহিলা দল) নেহেরুজির দূরদৃষ্টির প্রমাণ দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশেষত সহিষ্ণুতার প্রশ্নে তিনি বলেছেন, "জন্মসূত্রে আমি হিন্দু, সংস্কৃতিতে আমি মুসলমান, শিক্ষায় আমি খৃস্টান।" ১৯৫৫ সালে সংসদ কক্ষে খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন, "খৃস্ট ধর্মের জন্ম সময় যতটা প্রাচীন, ভারতবর্ষে তার আগমনও ততটাই প্রাচীন।" এক্ষেত্রে তিনি সেন্ট টমাসের আখ্যান বোঝাতে চেয়েছেন। কথিত আছে যিশু খ্রিস্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য সেন্ট টমাস ২০ বছর ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার করে ৫৮ খ্রিস্টাব্দে কোচিনে দেহরক্ষা করেছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতায় প্রগাঢ় আস্থা ও দায়বদ্ধতা ছিল পণ্ডিত নেহেরুর। সেই কারণে তিনি যখনই জানতে পারলেন ফৈজাবাদের জেলাশাসক ঘৃণ্য চক্রান্ত সংগঠিত করে ১৯৪৯ সালে বাবরি মসজিদে রাতের অন্ধকারে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই মুহূর্তে নেহেরুজি বাবরি মসজিদে তালা বন্ধ করে দেবার আদেশ দেন।

একদিকে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবি, অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরে হিন্দু কোড বিলকে আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিরোধিতার বাতাবরণ ছিল। নেহেরুজি বিষয়টি সংসদে অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করলেন। কারণ তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিছু ধর্মান্ধ, গোঁড়া, অন্ধ বিশ্বাসীরা মানুষকে রক্ষণশীল তৈরি করছে। সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য তিনি হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি— ন্যায়পরায়ণতাকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। যদিও শিখ ও বৌদ্ধরাও হিন্দু কোড বিলের ধারণায় বেষ্টিত হয়েছিলেন, কিন্তু নেহেরুজি জানতেন মুসলিম দেওয়ানি বিধি পরিবর্তন করা যাবে, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে থেকে পরিবর্তনের দাবি উঠে আসবে। না'হলে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবমূর্তিটি নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেনি, সেই রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আরএসএস) রাস্তায় নেমে হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতা করেছিল এবং শ্লোগান তুলেছিল, "পাকিস্তান তোড়দো, নেহেরু হুকুমত ছোড় দো।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬২ সালে জব্বলপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাকে এতটাই বিচলিত করে তোলে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে একটি পরিকাঠামোগত নিরন্তর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করেন। যদিও বর্তমান সরকার এই সংস্থাটিকে হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নেহেরুজি আদ্যন্ত একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুসংহতভাবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে, যে ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম সমন্বিত দেশে, কোনও একটি ধর্ম জাতীয়তাবাদের সমার্থক হতে পারে না। আরও বিশদে বলা যায়, ভারতবর্ষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদ হতে পারে না।

একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, কাশ্মীরের সমস্যা স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম স্তরেই নিস্পত্তি করা যেত যদি নেহেরুজি সমস্যাটি সমাধানে আরও একটু কূটনীতি প্রয়োগ করতেন।

কিন্তু শেখ আবদুল্লা একসময়ে বলেছিলেন, পণ্ডিত নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত এবং হিন্দু মৌলবাদের জয়— এ দুটির মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লেখক রামচন্দ্র গুহ তাঁর "ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী" বইটিতে জানিয়েছেন যে শেখ আবদুল্লা পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আয়ুব খানকে অংশগ্রহণে রাজি করতে যাবার আগে ১৯৬৪ সালে তিনমূর্তি ভবনে নেহেরুজির সাথে তিন ঘণ্টা আলোচনা করে সমস্যার প্রায় সমাধান সূত্র খুঁজে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বছরেই ভুবনেশ্বরে হঠাৎ নেহেরুজির মৃত্যু হওয়াতে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি ফলপ্রসূ হয়নি।

'ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা'— পণ্ডিত নেহেরুর 'মৌলিক চিন্তা' ভাবাটা একটু অতি সরলীকরণ। এই বিশাল দেশের পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে যে ঐতিহ্য প্রবাহিত হচ্ছে তা হল অহিংসা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধ অথবা খ্রিস্ট জন্ম পরবর্তী তৃতীয় সম্রাট অশোক অথবা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর আধুনিক ভারতবর্ষে অহিংসার যে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে তা সহিষ্ণুতারই নামান্তর।

ইতিহাসের যে উত্তরাধিকার পণ্ডিত নেহেরুর উপর অর্পিত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ তৈরি করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, ভারতের গণতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী হবে তখনই, যখন দেশবাসীর বিশ্বাসে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা উচ্চ আকাশে উত্তোলিত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার সংরক্ষণে তিনি আবারও কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন—

১। কোনও ধর্মকেই 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' স্বীকার করা হবে না,

২। সরকার কোনও ধর্মীয় শিক্ষায় স্বীকৃতি দেবে না,

৩। কোনও ধর্মই সরকারের ন্যায় বিচারের বাইরে নয়,

৪। এবং সহিষ্ণুতা— যা এই মুহূর্তে ভয়ংকর বিপদের মুখে।

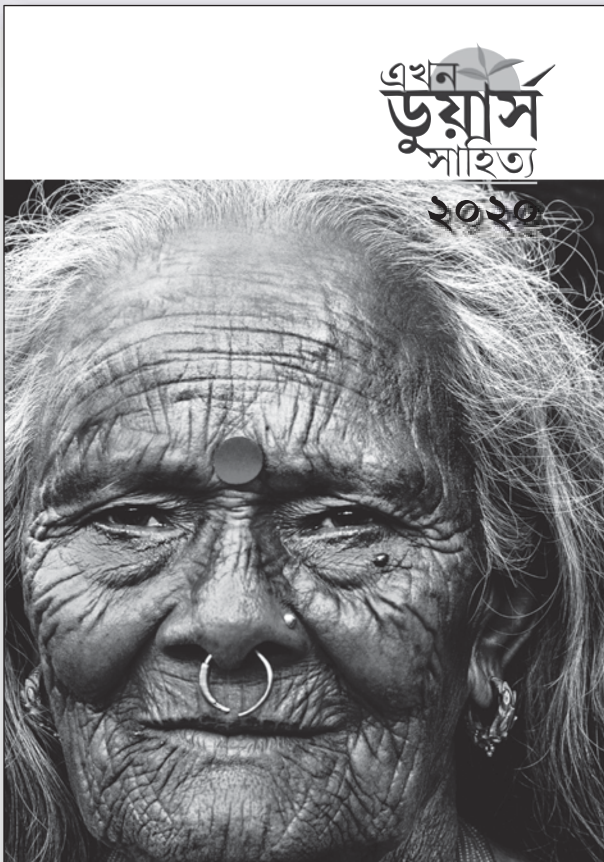

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস
বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প
পীযুষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঞ্জন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা
তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র।

শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি। বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ **জলপাইগুড়ি।** ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ **আলিপুরদুয়ার।** দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ **কোচবিহার।** জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪ **মালদা।** অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫ **কলকাতা।** বিশাল বুক সেন্টার, ৪ টোটি লেন, নিউ মার্কেট। ৪০৬৪৪০৯৭ অথবা না পেলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক। মূল্য ১৯৫ টাকা

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)
Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Rates are effective from April 1, 2018 issue

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩ উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পাহাড়ে বিপন্ন কমলালেবুর চাষ
আশা জোগাতে পারে ডুয়ার্স

গৌতম চক্রবর্তী

ডুয়ার্সে শীত আসা মানেই ছোট্ট বিকেল। পড়ে আসা রোদে পিঠ দিয়ে কমলালেবুর স্বাদে গন্ধে মন ভরানোর রোমাঞ্চকর দিনগুলি আজ অতীত। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন মাদারিহাট, বীরপাড়া, হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার শহর জুড়ে দেদার মিলত দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। ফলন তো কমেছেই, এখন যেটুকু হয় তা বাজারে প্রায় ঢোকেই না, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু সোজা চলে যায় কলকাতা সহ বিভিন্ন রাজ্যে। এখন ভুটানের লেবুও অমিল, চড়া দাম হাঁকে দোকানি। বাজারে আসে নাগপুরের কমলা যেগুলি রঙে হলদে হলেও স্বাদে ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে না। আর আসে কিনো। উত্তরের রাজ্য হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু থেকে আসা কমলার নিকট আত্মীয় কিনোতেই স্বাদ মেটাতে হয় সাধারণ ছাপোষা মানুষকে। কিনো দেখতে কমলালেবুর মতই তবে কমলার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল তার খোসা। কিনোর খোসা কমলালেবুর চেয়ে অনেক বেশি মোটা হওয়ার ফলে এগুলি গায়ে গায়ে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। খোসা ছাড়াতে গেলে ছিঁড়ে যায় অনেক সময়। তবে বাইরে থেকে তেমনভাবে বোঝা না যাওয়ার ফলে কমলালেবু কেনার সময় অনেক ক্রেতাই বুঝতে পারেন না। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার। অনেক সময় গ্রামের ক্রেতাকে সস্তার লেবু দিয়ে এক ধরনের প্রতারণাও চলে। সব মিলিয়ে তাই প্রশ্ন জাগে, মাটি আবহাওয়া অনুকূল থাকলেও ডুয়ার্সে কেন বিকল্প অর্থাগমের উদ্যোগ (ক্যাশক্রপ) হয়ে উঠছে না কমলালেবু ? আজ যখন প্রথাগত চাষবাস এর বেড়াজাল ভেঙে ডুয়ার্সের কৃষিজীবী মানুষ চাইছে দুটো পয়সা রোজগারের নিশ্চিন্ত পথ, তখন কমলালেবুর কথা কতটুকু ভাবা হচ্ছে ?

হুসলুডাঙ্গার কমলালেবু

ময়নাগুড়িব্লকের মল্লিকহাটের সখিন রায়ের কথা শুনেছিলাম। তাঁর বাড়িতে একটা কমলা গাছে সিজনে নাকি প্রায় হাজারখানেক ফল ধরে। গত ডিসেম্বরের এক রবিবারে বন্ধু গোঁসাইয়ের সঙ্গে গাড়ি চেপে হাজির হলাম হুসলুডাঙায়। মাঝে জটিলেশ্বর মন্দির এবং তার পরেই সখিনরায়ের সাকিন। চোখে পড়ল কয়েকশ' কমলালেবুতে হলুদ হয়ে থাকা একটা গাছ। জানা গেল কমলালেবুর বীজ থেকে চারা গজিয়ে ছিল এবং সেই চারা তুলে এনে সখিন রায় পুঁতেছিলেন উঠোনের ধারে। তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে ওটা কমলালেবুরই চারা। ফুট চারেক আকার ধারণ করার পর তিনি নিশ্চিন্ত হন। তখন গাছের চারপাশে ইটের গুঁড়ো আর গোবর সার দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছিলেন এবং বিশেষ আর কোনও যত্ন নেন নি। এর পরেই হল অবাক কান্ড। গাছের বয়স ৫ বছর হতেই ফল ধরা শুরু হল। অজস্র ফল এবং উজ্জ্বল রঙ, বড় আকার, মোটা খোসা। কমলালেবুর খোসা ছাড়ালে তা কোয়ার ওপর থেকে সুন্দরভাবে উঠে আসে। স্বাদ আর গন্ধ চমৎকার। গত চার বছর ধরে প্রচুর কমলা ফলাচ্ছে এই গাছ। সখিন রায় কমলালেবু বিক্রি করেন না। পরিবারের ছোটরাই রোজ দশ বারোটা করে কমলালেবু পেড়ে খায়। প্রতিবেশীদেরও বিলিয়ে দেন সখিন রায় তাঁর কমলালেবু। আমাদেরকেও পেড়ে দেওয়া হল গাছ থেকে। সখিন রায় জানালেন, এবার তিনি জমিতে কমলালেবুর চাষ করবেন বাণিজ্যিকভাবে। শুনে খুবই আনন্দ হল এই জন্যই যে, ডুয়ার্সে কমলালেবুর চাষের সম্ভাবনা অসীম এবং এটা জোর দিয়ে বলতে পারি বৈজ্ঞানিকভাবে চাষ হলে ডুয়ার্সের কমলা ভুটানের সেরা কমলালেবুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বিক্রির জন্য বাজারের কোনও অভাব নেই।

গরুবাথানের কমলা ঃ স্বাদ অতুলনীয়

ময়নাগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি ফরেস্ট পেরিয়ে চালসা। সেখান থেকে মাল নদী পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকতে হবে। দুদিকে চা বাগান এবং মাঝের রাস্তা পাকা। কিন্তু রাস্তায় অনেক স্পিড ব্রেকার। রাস্তাটা সোজা গিয়ে মিনগ্লাস চা ফ্যাক্টরির কাছে বড় রাস্তায় উঠেছে। কিছুটা গেলেই গরুবাথান বাজার এবং ডান হাতে পাকদন্ডী খাড়া পাহাড় বেয়ে ছয় কিলোমিটার গেলে কমলালেবুর স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ি গ্রাম বিচগাঁও, রাইগাঁও এবং গৌরিগাঁও। সেখানকার প্রায় সবার পদবী রাই আর সকলেই নিরামিষভোজী কবির পন্থী সন্ত। ৭২ বছরের যশ বাহাদুর রাই তার কমলালেবুর বাগান ঘুরিয়ে দেখালেন। কমলায় সবেমাত্র পাক ধরেছে। গাছ থেকে ছিঁড়ে একটা খেতে দিলেন এবং খোসা ছাড়াতে চারিদিক সুগন্ধে ভরে গেল। কমলালেবু খাসা মিষ্টি। সবার বাড়িতেই সুপারি বাগান এবং তার মধ্যেই কমলালেবুর গাছ। পাতা পচা জৈব সার আর গোবর দেন গাছের গোড়ায় এবং তারা কোনওরকম কীটনাশক স্প্রে করেন না। দেখা করতে এলেন ইন্দ্রমনি রাই, তিলক রাই, মহিন্দ্র রাই, গঙ্গা রাই, ইয়াওন কুমার, আর বাহরমান সুব্বা। ইয়াওন কুমার বাংলা জানেন। এতক্ষণ আধা নেপালি আর আধা হিন্দিতে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। কুমার দাজু জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাগানে। রাশি রাশি কমলা পেকে আছে। নিজেরাই গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যান মঙ্গলবাড়ি, ওদলাবাড়ি, সোমবারি এবং মালবাজার। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু সৎ মানুষগুলোর সাধের কমলালেবু বেশিরভাগ সময় সমতলের হিসেবি মানুষ কম দামে কিনে নিলেও কোনও লোভ বা ক্ষোভ নেই সহজ মানুষগুলির। ডুয়ার্সের মাটিতে কমলালেবুর চাষ যে অসম্ভব নয় এই আশার বার্তাটি তো

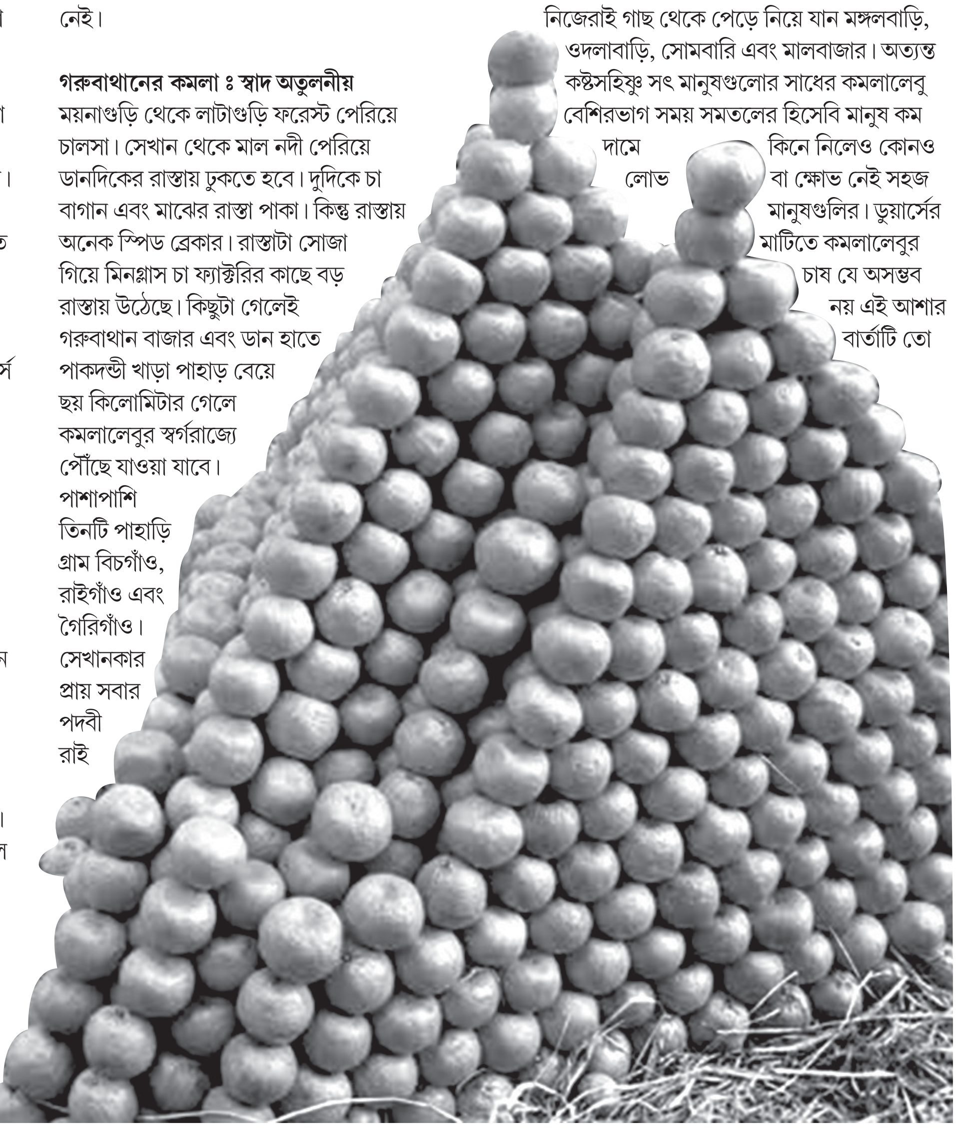

নিজেদের অজান্তেই ডুয়ার্সের কোণে কোণে পৌঁছে দেবে এরাই।

দার্জিলিংয়ের কমলালেবু হারিয়ে যাওয়ার মুখে

দার্জিলিং পাহাড়ে কমলালেবুর উৎপাদন ক্রমশ কমছে। গত পাঁচ বছরে এখানে কমলালেবু উৎপাদন ৬০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে কমলালেবু ছোট থাকা অবস্থাতেই ঝরে পড়ছে। গাছগুলিও রোগপোকার আক্রমণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সঠিক পরামর্শ বা সরকারি সাহায্য সেভাবে না পাওয়ার ফলে কমলালেবু চাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন চাষীরা। পাঁচ বছর আগেও যে চাষী দুই গাড়ি কমলালেবু শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রির জন্য পাঠাতেন, তিনি দুই বা তিন ঝুড়ি কমলালেবু বাজারে পাঠাতে পারবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তিনি বললেন, প্রত্যেক বছর দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর উৎপাদন কমছে। আমাদের এখনই দীর্ঘমেয়াদী কোনও প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে দার্জিলিংয়ের কমলা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর জগৎজোড়া খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু গত ১০ বছরে এই কমলালেবুর উৎপাদন যেমন কমেছে, তেমনি এখানকার কমলালেবুর আকার ছোট হয়ে গিয়ে মিষ্টতাও অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। রোগপোকার আক্রমণকেই দায়ী করছেন চাষী থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ সকলেই। উদ্যানপালন বিভাগের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, সাইরাসট্রেস টিজা এবং ছত্রাকের আক্রমণে কমলালেবু এবং গাছ দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গাছে ফুল আসা থেকে শুরু করে কমলালেবু বড় হবার আগেই অর্ধেকের বেশি ফল এই পোকার আক্রমণে ঝরে যাচ্ছে। গাছের পাতা খেয়ে নিচ্ছে পোকায়। যে পরিমাণ ফল গাছে থাকছে সেগুলিতে পাকা রং আসার পরেই পোকা ধরে পচে গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে। দার্জিলিংয়ের মেরি বঙের কমলা চাষী কিষান ছেত্রী জানান, কয়েকবছর আগেও তার জমিতে কমলালেবু চাষ করে শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রির জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিন চার বছর ধরে উৎপাদন কমতে কমতে কার্যত শেষ হয়ে এসেছে। যে বাগানে আগে ৬০-৭০ হাজার ফল হত সেখানে সব মিলিয়ে গত বছরে ৫ হাজার ভাল কমলা বিক্রির জন্য খুঁজে বের করাই কঠিন। রোগপোকাই সবকিছু শেষ করে দিচ্ছে।

পাহাড়ে কমলালেবুর সিংহভাগ চাষই হয় মিরিক, সৌরিনি, সিটং, লাটপাঞ্চার এবং মংপং এলাকায়। সিটং-এর চাষী সমীর তামাং, লক্ষ্মী লিম্বুরা বলেন, কমলালেবুর চাষ করে আগে আমাদের সংসার চলত। জানুয়ারি মাসে ফল বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত সেই টাকা দিয়ে এবং অন্য কাজ করে বছরভর সংসার চলে যেত। কিন্তু এখন কমলালেবু চাষ করে এক মাসও বসে খাওয়ার উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে কিছু এলাচ, আদা চাষ করার পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজও করতে হয়। তাতেও সংসার টানা দায় হয়ে পড়েছে। কমলালেবুতে এত পোকার আক্রমণ হচ্ছে যে সেগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কারোরই জানা নেই। কোনও সরকারি আধিকারিকও তাদের গ্রামে এসে কোনও পরামর্শ দেয় না। গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে তাই কমলালেবু চাষ ছেড়ে দিচ্ছে। উদ্যানপালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে যে ভ্যারাইটি কমলালেবু চাষ করা হয় তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে সেভাবে উৎপাদন এবং গাছের চারা তৈরি না হওয়ার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিকদের মতে, পোকা সমস্যা সমাধানকল্পে নাগপুরের কমলা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা বলেছেন গোটা ভারতেই কমলালেবুর এই সমস্যা চলছে। তবে পাহাড়ের চাষীদের নতুন চারাগাছ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল গত বছর। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পরিকল্পনা নেওয়া শুরু হয়েছে।

কমলা চাষে আশা জোগাতে পারে ডুয়ার্স। কমলালেবুর ফলন ক্রমেই কমে আসছে ভুটান পাহাড়ের কমলালেবু চাষেও। বাজার দখল করেছে নাগপুরের কমলা। এইসময় তাই প্রশ্ন উঠছে ডুয়ার্সের মাটিতে বিকল্প চাষের অঙ্গ হিসাবে কমলালেবুর চাষকে জনপ্রিয় করা যায় কিনা। ডুয়ার্সের মাটিতে ভাল জাতের কমলালেবুর ফলন কিন্তু নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। টোটোপাড়ায় একসময় জোরদার কমলালেবুর চাষ হত। কৃষিকাজে অভ্যস্ত টোটোরা এখন হয়ত আর নতুন করে কমলালেবুর চাষ করে না।

কমলা চাষে আশা জোগাতে পারে ডুয়ার্স

কমলালেবুর ফলন ক্রমেই কমে আসছে ভুটান পাহাড়ের কমলালেবু চাষেও। বাজার দখল করেছে নাগপুরের কমলা। এইসময় তাই প্রশ্ন উঠছে ডুয়ার্সের মাটিতে বিকল্প চাষের অঙ্গ হিসাবে কমলালেবুর চাষকে জনপ্রিয় করা যায় কিনা। ডুয়ার্সের মাটিতে ভাল জাতের কমলালেবুর ফলন কিন্তু নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। টোটোপাড়ায় একসময় জোরদার কমলালেবুর চাষ হত। কৃষিকাজে অভ্যস্ত টোটোরা এখন হয়ত আর নতুন করে কমলালেবুর চাষ করে না। কিন্তু টুকি টোটো বা সেনটু টোটোর গোটা পঞ্চাশেক কমলালেবু গাছ এখনও কিন্তু টিকে আছে। সাক্ষী হিসাবে মাদারিহাট ব্লক এর উত্তরে ছেকামারি গ্রামে সতীশ নার্জিনারির ফলের বাগানে এই সময় ঢুকলে কমলালেবুর সুগন্ধে মন ভরে যাবে। তেমনি বক্সা পাহাড়ে লেপচাখা বা আদমার গ্রামে কিছু কমলালেবুর বাগান এখনও ফল দিচ্ছে। যেমন ছড়িয়ে রয়েছে সমতল ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে কমলালেবুর আবাদগুলিও। মাদারিহাটে কমলালেবুর বাগান শুরু হয়েছে বলে শোনা যায়। এগুলির ফলন নাকি বেশ ভাল হচ্ছে আর জাতটাও ভাল। রামসাইতেও মিষ্টি কমলালেবুর চাষ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ডুয়ার্সে দেরিতে হলেও কমলালেবুর চাষ নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে এ দাবি করাই যায়! কিন্তু তবু সেই ব্যাপক সাড়া মিলছে না কেন?

গত শীতে জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগরে জেলা উদ্যানপালন বিভাগ এর সরকারি দপ্তরে কমলালেবু চাষের এই দৈন্যদশার কথা জানতে গেলে আশার কথা শুনিয়েছিলেন আধিকারিক শুভাশিস গিরি। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কিছু নতুন কমলাবাগান তৈরি করার কাজ শুরু করেছেন তাঁরা। বক্সা এবং মেটেলিতে প্রায় ১১০বিঘা জমিতে আট হাজারের বেশি কমলালেবুর চারা রোপণ করা হয়েছে, যেগুলি আনা হয়েছে কালিম্পং এর সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে। ডুয়ার্সের মাটিতে কমলালেবুর চাষে উৎসাহ বাড়াতে সুলভে চারা বিক্রি করছেন সতীশ নার্জিনারি এবং তাঁর মতে ঢালু পাথুরে জমি যেখানে জল দাঁড়ায় না সেখানেই ভাল কমলালেবু চাষের ভাল ফল মিলতে পারে। ডুয়ার্সে বহু নদীর ধার বরাবর বা অন্যত্র এই ধরনের জমির কোনও অভাব নেই, অভাব কেবলমাত্র রয়েছে বাগিচা পালনের। যেসব কমলালেবু গাছের বয়স ১৫ বা ২০ বছর হয়ে গেছে সেগুলির বদলে নতুন উন্নত মানের যে চারা লাগে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন এই জন্যই যে, পুরনো গাছে লেবু উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পায়। কমলালেবুর ফলন শুরু হয়ে যায় গাছের বয়স চার বছর পেরোতেই। তবে পরিবেশ এবং জলবায়ু ঠিকঠাক থাকাটাও সুস্বাদু লেবু চাষের অন্যতম প্রধান শর্ত।

মরসুমী ফল হিসাবে কমলালেবুর খাদ্যগুণ নিঃসন্দেহে অপরিসীম। একাধারে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রচুর ফাইবার থাকে বলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সাহায্য করে। পাহাড় ঘেরা ডুয়ার্সে শীতের প্রকোপ ঠেকাতে কিংবা অসুস্থ রোগীকে চাঙ্গা করে তুলতে অথবা স্কুল ফেরত কচিকাঁচাদের টিফিন পিরিওডে সহজে পেট ভরাতে কমলালেবুর কোনও বিকল্প নেই। ডুয়ার্সের জ্যাম জেলির চাহিদার একটা বড় অংশ ভুটানের কারখানাগুলি মিটিয়ে থাকে। উদ্যোগ নিয়ে কমলা চাষ করলে কেবল ফলই নয়, তা থেকে জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ এসব তৈরি করার ব্যবসাও হতে পারত। কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে। কমলালেবুপ্রেমী মানুষের চাহিদা মেটাতে ডুয়ার্স জুড়ে রাজ করছে পাঞ্জাব এবং নাগপুরের কমলা যেগুলির ফলন হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা পরিবেশে এবং এর ফলে দরিদ্র মানুষের হাতে অতি সুলভে মরসুমি ফল তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ডুয়ার্সের কৃষিজীবির মনে প্রশ্ন দেখা দেওয়া যেতে পারে যে এখানেও সেইরকম কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে কমলালেবুর ফলন ফলানো যায় কিনা। কারণ তাহলে সেই কমলালেবু গুণমানে পাঞ্জাব বা নাগপুরের কমলার চাইতে কোনও অংশে খারাপ হত না। এ কথা নিশ্চিতভাবেই দাবি করতে পারে সেই চাষী, কারণ সে এখনও সেই স্বপ্ন দেখে।

গান্ধী ১৫০। খোলা মনে

মহাত্মার জীবন ও দর্শন অপ্রিয় রয়ে গিয়েছে বাঙ্গালির কাছে !

কল্যাণ গোস্বামী

সত্যাগ্রহ ও অহিংস আন্দোলনের মত বিরল কিন্তু শক্তিশালী অস্ত্রের দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন গান্ধীজি। যারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের কাছে গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মধারা বরাবর বিতর্কিত থেকে গেছে। তবুও আপামর মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন পেতে নিয়েছেন এই আত্মত্যাগী ব্যক্তি।

গান্ধীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি, ব্যক্তি হিসেবে তার পরিবর্তনের ধারা। একজন সাধারণ, দেহসর্বস্ব মানুষ থেকে মহতী চিন্তাধারায় ভরপুর ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনপ্রণালীর ধারক ও বাহক, একজন মনীষী হয়ে উঠেছিলেন গান্ধীজি। আর এ কারণেই তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং এর মত সংগ্রামী নেতাদের প্রণম্য হন।

১৮৮৮ সালে গান্ধীজি ভাবনগরের শ্যামলদাস কলেজে কয়েক বছর লেখাপড়া করে, লন্ডনে আইন পড়তে যান। মাংস আর মেয়েমানুষ থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করে গান্ধী তাঁর মা আর স্ত্রীকে রাজি করান তাকে লন্ডন যাত্রার অনুমতি দিতে। লন্ডনে গিয়ে গান্ধী তার কথা রাখেন। একটি নিরামিশাষী সংগঠনে যোগ দেন এবং ভগবৎ গীতার সংস্পর্শে আসেন। গীতা ধর্মগ্রন্থ গান্ধীর জীবনে এক বিশাল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল।

লন্ডন থেকে ফেরার পর আইনজীবী হিসেবে কাজ পেতে গান্ধীর বেশ বেগ পেতে হয়। এ সময় ১৮৯৩ সালে এগিয়ে আসেন দাদা আব্দুল্লাহ। দাদা আব্দুল্লাহ ছিলেন এক বণিক যার দক্ষিণ আফ্রিকায় জাহাজের ব্যবসা ছিল। নিজের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের আইনজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা আসার আমন্ত্রণ জানান তিনি। এই আমন্ত্রণই ছিল গান্ধীর জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গান্ধী যান, তিনি পরে সম্পূর্ণ এক আলাদা গান্ধী হয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

একে কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর ভারতীয় হওয়ার কারণে লাগাতার জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হয়ে গান্ধীজির ভেতরে এক সংগ্রামী সত্ত্বা তৈরি হয়ে ওঠে। তিনি নিয়ম করে সেই কেসগুলোই লড়তে থাকেন যা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও অন্যান্য

গান্ধীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল অসহযোগ আন্দোলন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশরা ভারতে জেঁকে বসতে পেরেছে ভারতীয়দের পরোক্ষ সহযোগিতার কারণেই। আর তাই তিনি দেশবাসীকে ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগে নামতে উদ্বুদ্ধ করেন। গান্ধীজির নীতি ছিল কোনওপ্রকার হিংসায় না জড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, ব্রিটিশদের পণ্য বর্জন করা, খাদ্য-বস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থের সাথে জড়িত ছিল। দীর্ঘ একুশ বছর আফ্রিকায় বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়ে ১৯১৫ সালে গান্ধীজি দেশে ফেরেন। ততদিনে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যের রাজনীতির বিরুদ্ধে গান্ধীজির দৃঢ় অবস্থান তাকে একজন জাতীয়তাবাদী, তত্ত্ববাদী ও সংগঠক হিসেবে খ্যাত করে তুলেছে। কংগ্রেসের বড় নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্বে গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দান করেন।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজি একাধিক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বলা হয়। কৃষকদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধী কঠোর অবস্থান নেন। চম্পারণ ও খেদার কৃষক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালের বন্যায় খেদার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরেও ব্রিটিশ সরকার খাজনা মুকুব না করলে তিনি কৃষকদের ব্রিটিশ সরকারকে প্রদেয় সকল প্রকার শুল্ক দিতে নিষেধ করে দেন। এই সফল আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজ অবস্থানে নমনীয় হতে বাধ্য হয়।

গান্ধীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল

অসহযোগ আন্দোলন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশরা ভারতে জেঁকে বসতে পেরেছে ভারতীয়দের পরোক্ষ সহযোগিতার কারণেই। আর তাই তিনি দেশবাসীকে ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগে নামতে উদ্বুদ্ধ করেন। গান্ধীজির নীতি ছিল কোনওপ্রকার হিংসায় না জড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, ব্রিটিশদের পণ্য বর্জন করা, খাদ্য-বস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

এভাবেই অসহযোগ আন্দোলনের সাথে 'স্বরাজ' নীতি সংযুক্ত হয়। গান্ধীজি ভারতবাসীদের ব্রিটিশ সরকারের চাকরি, ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন, ব্রিটিশ আদালতে আইনচর্চা সবকিছু থেকে অব্যাহতি নেওয়ার আহবান জানান।

তবে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন অহিংস থাকে নি। বহুদিনের বৈষম্যে জর্জরিত ভারতবাসী ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই উত্তাপ আগুন হয়ে জ্বালিয়ে দেয় উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানার ২২ জন পুলিশকে। দিনটি ছিল ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। এই ঘটনার পর গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের ডাক দেন। ১০ মার্চ তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ও ৬ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

গান্ধী জানতেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দু-মুসলিম একতা কতটা প্রয়োজনীয়, আর তাই খিলাফত আন্দোলনেও তিনি সমান তালে আত্মনিয়োগ করেন। খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গান্ধী মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করলেও অনেক হিন্দুবাদী নেতা এতে অসন্তুষ্ট হন।

১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার লবণের উপর কর আরোপ ও ভারতীয়দের লবণ উৎপাদন বেআইনি ঘোষণা করলে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। প্রতিবাদ হিসেবে তিনি নিজের সবরমতি আশ্রম থেকে ২৪০ মাইল দূরের সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম ডান্ডি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। ১২ মার্চ ১৯৩০, ৭৮ জন বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে গান্ধীজি এই যাত্রা শুরু করেন। প্রতিদিন ১০ মাইল করে হেঁটে তারা ২৪ দিনে ২৪০ মাইল পথ পাড়ি দেন। এই যাত্রাপথে অগণিত মানুষ তার সঙ্গী হন। ৬ এপ্রিল গান্ধীজি ডান্ডি পৌঁছান এবং লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীকে আবারও জেলবন্দী করে, সেই সাথে আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রায় ৬০,০০০ মানুষকেও। এই সফল আন্দোলনের ফলেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয় ১৯৩১ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গান্ধীজি শুরু করেন 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। এবার আর কোনও পরোক্ষ নীতি অবলম্বন না করে সরাসরি ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার দাবি জানান তিনি। এটি ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সবচেয়ে মারমুখী আন্দোলন। ৯ আগস্ট ১৯৪২ এ গান্ধীকে গ্রেফতার করে পুনের আগা খাঁ প্যালেসে আটকে রাখা হয়। '১৯৪৩ এর শেষের দিকে বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করলে আন্দোলনটি থামে'।

১৯৪৭ সালে অবশেষে ভারত স্বাধীন হয়। কিন্তু গান্ধীজি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক বেশি কঠিন। আর তাই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উপর। কিন্তু উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্রতা গান্ধীর সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়। দাঙ্গা থামানোর উদ্দেশ্যে আহত হৃদয়ে ৭৮ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করেন। পার্টিশন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তানকে প্রদেয় ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়ার উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন। রাজনৈতিক নেতারা শেষমেষ তার দাবি মেনে নিলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। মহাত্মা গান্ধীর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রচেষ্টা অনেক হিন্দু মৌলবাদীর চক্ষুশূল ছিল।

দলিত ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগকারী গান্ধী এক ভারতবাসীর হাতেই নিহত হন। নথুরাম গোডসে ও তার সহযোগী নারায়ণ আপ্তেকে বিচারের আওতায় আনা হয় ও

যখন গোটা দেশ গান্ধীজির ডাকে নতুন করে জেগে উঠছে, সুভাষও কিন্তু সে ডাকে অন্তর থেকে সাড়া দিয়েছিলেন। ক্রমে সুভাষের বাংলার রাজনীতিতে অনবদ্য উত্থান এবং তারপর খোদ মহাত্মার সঙ্গে সংঘাতের পথ নেওয়ায়, বাঙালিরা ধীরে ধীরে গান্ধীজির থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। দু'জনের ভাবনার ধরনে পদ্ধতিগত তফাৎ থাকলেও, একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধায় কোনও ঘাটতি ছিল না। কিন্তু তার পরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেই যায় গান্ধী-সুভাষ সংঘাত, যার থেকে বাঙালিরা কোনওদিনই বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৫ নভেম্বর ১৯৪৯, তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কাঠগড়ায় দন্ডায়মান এই ষড়যন্ত্রকারীরা কিন্তু শেষ অবধি বিশ্বাস করে গেছে যে গান্ধীকে হত্যা করে মূলত তারা দেশের স্বার্থেই কাজ করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, পাকিস্তানকে পার্টিশনের প্রদত্ত অর্থ দিতে বাধ্য করে গান্ধী ভারতকে দুর্বল করে দিয়েছেন। গান্ধীর হত্যাকান্ডটি যেন এক কালের সমাপ্তি ও আরেক নতুন কালের সূচনার স্মারক, যে সময়ে ভারত যাত্রা করে এক সাম্প্রদায়িক অনৈক্য জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে।

পরিশেষে, একজন বাঙালি হিসেবে, কিছু বিশেষ কথা না বললে, এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল প্রবক্তা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্ক নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ইতিহাসের এক বিতর্কিত অধ্যায়। বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নেতাজীর চিন্তাধারায় অধিক বিশ্বাস রেখেছে। মনে রাখা দরকার, যখন গোটা দেশ গান্ধীজির ডাকে নতুন করে জেগে উঠছে, সুভাষও কিন্তু সে ডাকে অন্তর থেকে সাড়া দিয়েছিলেন। ক্রমে সুভাষের বাংলার রাজনীতিতে অনবদ্য উত্থান এবং তারপর খোদ মহাত্মার সঙ্গে সংঘাতের পথ নেওয়ায়, বাঙালিরা ধীরে ধীরে গান্ধীজির থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। দু'জনের ভাবনার ধরনে পদ্ধতিগত তফাৎ থাকলেও, একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধায় কোনও ঘাটতি ছিল না। গান্ধী যেমন সুভাষকে 'প্রিন্স অ্যামং দ্য পেট্রিয়ট ' আখ্যা দিয়েছিলেন, আবার সুভাষও মহাত্মাকে 'ফাদার অফ দ্য নেশন' বলেছেন। কিন্তু তার পরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেই যায় গান্ধী-সুভাষ সংঘাত, যার থেকে বাঙালিরা কোনওদিনই বেরিয়ে আসতে পারে নি।

সাধারণ মানুষের বোঝার ব্যাপার না হলেও বলি, ত্রিপুরি এবং হরিপুরা সম্মেলনে, জওহরলাল কংগ্রেসের সংহতি চেয়েছিলেন এবং সে সময় মহাত্মাজির নেতৃত্ব ছাড়া এটা সম্ভব নয়, সেটা জওহরলাল জানতেন। কিন্তু নেতাজী সুভাষ সেটা হয়ত বুঝতে পারেন নি। তিনি চ্যালেঞ্জের পথে গেলেন, যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কংগ্রেসের সংহতি। সেইখানে মহাত্মাজীকে সমর্থন করাটাই রাইট পলিসি হত। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সেই পথেই গিয়েছিল, নেহরুও সেই পথেই গিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা পেতে হলে, সেটারই দরকার ছিল।

তবে শেষে গিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসু স্পষ্ট বুঝলেন, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে গেলে, তাঁকে এক অর্থে একঘরে হয়ে যেতে হবে। প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়লেন, তবে মহাত্মার প্রতি ওনার শ্রদ্ধা, ভালবাসা অটুট ছিল, তিনি লিখলেন, "আমি তো সর্বক্ষণই চেষ্টা করে যাব, মহাত্মার আস্থা ফিরে পেতে। গোটা দেশের মানুষের আস্থা, ভালবাসা পেলাম, অথচ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিরই আস্থা অর্জন করতে না পারলে তা অত্যন্ত দুঃখজনক"।

কিন্তু যেটা না বললেই নয়, কংগ্রেস থেকে নেতাজীর পদত্যাগের পর থেকে বাঙালিরা কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর উপরে আর ততটা শ্রদ্ধা ভক্তি রাখতে পারে নি। সাতচল্লিশের দেশভাগের কুফল নরকযন্ত্রণা ভোগা বাঙালির চোখে গান্ধী অপ্রিয় হয়েছেন। দেশভাগ নিয়ে গোটা কংগ্রেসের দায়ভার একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন গান্ধী, সাগরের সব বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হতে চেয়েছেন। দেশের রাজনীতিতে নব্য সুযোগসন্ধানীরা সেই ফায়দা তুলেছেন পুরোটা। তাঁর কংগ্রেসে নেতৃত্ব দেওয়ার একশ বছর হয়ে গেল তবু কোনও নেতা আজ অবধি বাঙালিদের এই ভুল বোঝার অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেন নি। মহাত্মার জীবন ও দর্শন অপ্রিয় রয়ে গিয়েছে সমগ্র বাঙ্গালির কাছে। এ দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতিরই।

কবির কলমে

বালাবৃত্তান্ত

উত্তম চৌধুরী

বক্সামোড় পেরিয়ে কিছুদূর পুবে গেলেই বালা নদী। তারপর জয়ন্তী। বালা নদীতে বালির আধিক্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন নদীর ওপর ঝাঁ চকচকে ব্রিজে দাঁড়িয়ে একবার উত্তর ও আরেকবার দক্ষিণে তাকাই। সবুজের সমারোহ। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ঝোরা। অজস্র যুবক-যুবতী এখানে এসে সেলফি তোলে। কয়েকজনকে মুখবইয়ে (ফেসবুক) দেখা গিয়েছিল ব্রিজের ওপর শুয়ে ছবি তুলতে। জয়ন্তী এবং বক্সার ২৮ ও ২৯ বস্তির সাধারণ মানুষের অন্যতম দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই পাকা ব্রিজটির। বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এই প্রাপ্তি।

ব্রিজটি তৈরি হওয়ায় বর্ষায় সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি তা দূর হয়েছে। ভোগান্তি কী রকম তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার একজন জয়ন্তী থেকে এক গর্ভবতী মহিলাকে জিপে চড়িয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। বালা নদীতে এসে দেখে প্রচুর জল। নদীর জল কমার জন্য জিপটি পাড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। জলের স্রোত কিছুটা কমলেও তেমন নয়। সরাসরি পার হতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। নদীর ওপর সিমেন্টের ঢালাই করা ছিল। অনেকদিন আগেই ভেঙে গিয়েছিল তার কিছুটা। মাঝে মাঝে বিশাল গর্ত। জিপটি নদীর ওপর রাস্তা ছেড়ে প্রায় ২০০ মিটার দূরে দক্ষিণ দিক দিয়ে পার হয়ে মূল রাস্তায় ওঠে। ঝুঁকি ছিল সে কাজে। নদীর বালিতে চাকা আটকে গেলে ভীষণ ঝামেলায় পড়তে হত।

এর কিছুদিন পর একটি স্টেট বাস নদীতে পাল্টি খেল। অর্ধ সমাধির মত অবস্থা বাসটির। বেশ কয়েক ঘন্টা নদীতেই পড়েছিল। পরে নদীর জল কমে গেলে ক্রেনের সাহায্যে বাসটিকে ওঠানো হয়। সেখানে বস্তির অনেক মানুষ জমা হয়েছিল এই উদ্ধারের দৃশ্য দেখার জন্য। হড়কা বানের সম্মুখীন হয়েছিল একটি বোল্ডার বোঝাই ট্রাক। পাহাড়ে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে যাওয়া প্রচন্ড জলের স্রোতের শব্দে ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে সামনেই বিশাল জলের ঢেউ। সে জঙ্গলে ট্রাক ঢুকিয়ে সেই যাত্রায় রক্ষা পেল।

বর্ষায় প্রচুর বোল্ডার আসত বালা নদীতে। স্থানীয় শ্রমিকেরা কাজ পেত। ওরা ট্রাক বোঝাই করত বোল্ডারে। এখন আর পারমিট দেওয়া হয় না নদী থেকে বোল্ডার উত্তোলনের। বালি-পাথর নদী থেকে তোলা হলে নদীর গভীরতা বজায় থাকত। এখন রিভার বেড উঁচু হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জল বইতে থাকে। এতে গাছগাছালির ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে বন্য প্রাণীদের আস্তানাও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। জয়ন্তীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ১৯৯৩ সালের আগে ব্রিজের অনেক নীচে নদী ছিল। এখন নদীর বুক উঁচু হতে হতে

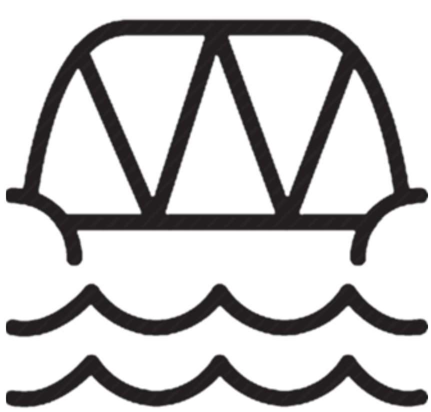

বর্ষায় প্রচুর বোল্ডার আসত বালা নদীতে। স্থানীয় শ্রমিকেরা কাজ পেত। ওরা ট্রাক বোঝাই করত বোল্ডারে। এখন আর পারমিট দেওয়া হয় না নদী থেকে বোল্ডার উত্তোলনের। বালি-পাথর নদী থেকে তোলা হলে নদীর গভীরতা বজায় থাকত। এখন রিভার বেড উঁচু হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জল বইতে থাকে। এতে গাছগাছালির ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে বন্য প্রাণীদের আস্তানাও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

ব্রিজের ভগ্নাংশকেও প্রায় ঢেকে ফেলেছে। লোকালয় দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে। আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় প্রহর গোনে জয়ন্তীবাসী। তাদের আশঙ্কা হয়তো সমস্ত জনপদই নদী হয়ে যাবে একদিন। মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে শতাব্দী প্রাচীন এই ছোট্ট জনপদ।

এমনও অনেকদিন হয়েছে যে বালা নদীতে এসে বাস দাঁড়িয়ে গেল। জল কমবার নামগন্ধ নেই। পাহাড়ে প্রচন্ড বৃষ্টি। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয়ে জয়ন্তীর দিকে হেঁটেই রওনা দিচ্ছে। শহরে ফিরে গিয়ে বিকেলে আবার বাসটি বালা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ত সেখান থেকে। আমরা আবার জয়ন্তী থেকে হেঁটে এসে বাস ধরতাম। জল কম থাকলে বাসটি জয়ন্তীতে যেত এবং বিকেলে সেখান থেকেই শহরে ফিরতাম।

এমন এক বর্ষার দিনে আমরা নদী পেরোচ্ছি। কেউ কেউ মাঝ নদী বরাবর পৌঁছে গেছে। হঠাতই দেখা গেল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে এক হাতি আমাদের উল্টো দিক থেকে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। হাতিটি জলে পা রাখতেই যাত্রীদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল। অনেকেই হুড়োহুড়ি করতে লাগল বাসে উঠে বসার জন্য। দেখা গেল হাতিটি কিছুটা জলে নেমে কী যেন পরখ করে আবার জঙ্গলে ঢুকে গেল।

আরেকদিন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাঁ দিকে জঙ্গল পাহাড়ে চোখ রাখতেই দেখি দুটো দাঁতাল হাতি দু-পাড়ের জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তীব্র গর্জন করছে। একটি নদী পার হয়ে সোজা আরেকটির সামনে এসে দাঁড়াল। শুঁড়ে শুঁড়ে কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর দুটোই গর্জন করে ওঠে। তারপর নিজেরাই রণে ভঙ্গ দেয়।

বর্ষায় মহিলারা ধীরে ধীরে নদী পার হত। বয়স্ক বা বয়স্কাদের পিঠে চড়িয়ে পার করত স্থানীয় যুবকরা। নতুন ব্রিজটি অজস্র মানুষের সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছে। ৯৩-এর বিধ্বংসী বন্যায় প্রচুর গাছ ভেসে এসেছিল নদীতে। বছর পার হয়ে গিয়েছিল সেইসব গাছ নদীর বুক থেকে কেটে কেটে সরাতে। বালা নদীর দু'পাশেই প্রচুর কারিপাতার এবং বুনো লেবুর গাছ ছিল। আমরা লেবু সংগ্রহ করতাম। কারিপাতা খাওয়ার জন্য নিয়ে যেতাম। বসন্তে জঙ্গলে ফুটে থাকা বিভিন্ন ফুল বিশেষত সাদা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনাঝুরি, জারুল চোখ জুড়িয়ে দিত।

একদিন বাস ধরতে পারিনি বলে আমার খুব সমস্যা হল। রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত এসে ভাবছি কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছব। একটি ট্রাক দেখে থামালাম। সেটিতে চড়ে বক্সা মোড়ে আসি। এরপর আর কোনও কিছু নেই। কোনও মানুষও নেই আমার সহযাত্রী হিসেবে। তখন আলিপুরদুয়ার জংশন-জয়ন্তীর ট্রেন চলাচল বন্ধ হলেও লাইনটি ছিল। আমি নিজের এগারো নম্বরের ওপর ভরসা করে চলতে লাগলাম। বালা নদীর ওপর দিয়ে না গিয়ে রেল ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটছি। একটি শুকনো ডাল সংগ্রহ করেছিলাম আত্মরক্ষার জন্য, যদি চিতাবাঘ বা অন্য জন্তু আক্রমন করে। হাতি, হরিণ, বানর, ময়ূর, শুয়োর, বুনো কুকুর, মুরগি অনেক দেখেছি কিন্তু বাঘ কোনওদিন চোখে পড়েনি, যদিও বাঘসুমারিতে তার অস্তিত্ব বক্সা ব্যাঘ্র-অরণ্যে পাওয়া গিয়েছিল।

২০০১ সালের আগস্টের শেষের দিকে আমি আমার কর্মস্থল পরিবর্তন করি। বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক- শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ জয়ন্তী থেকে বালা নদী পর্যন্ত আসে। পথে হাঁটতে হাঁটতে কবিতা শুনিয়েছিলাম। কেউ কেউ গান ধরেছিল। নদী পেরিয়ে বাসে ওঠার আগে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম কারও কারও চোখ ছল ছল করছে, করুণ মুখ। সে দৃশ্য ভুলে যাইনি আজও।

বেশ্যাপাড়ার একটি গুজব

উত্তরের উপকথা

গুজবই বলুন বা লোকশ্রুতি, আদতে সেগুলি সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত এক একটি ঘটনা বা গল্প। লোককথার অনেক শাখার মধ্যে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জাতি বা জনজীবনের ঝিনুক জমিয়ে রাখা অজানা ইতিহাসের বালুকণার ওপর মিথ্যে-সত্যি-অনুমান-আন্দাজের পরত লেগে লেগে সেটি গুজব নামক মুক্তোর জন্ম দেয়। আমজনতাও সেটিকে দিব্যি বুকে চেপে রাখে যুগের পর যুগ, পরম মমতায়, যত্নে।

যাঁর কাছে এই গুজবটি শোনা, তিনি অবশ্য বললেন 'লোকে কয়'। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন যা ডুয়ার্স, সেটিকে যদি প্রাচীন কামতা রাজ্য বলে ধরি তবে গণিকা পতিতা বেবুশ্যে বারাঙ্গনা দুয়োরানীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। হুদুমপুজোর উপকরণে বেশ্যার চুল অথবা গোসানীমঙ্গলের পদে বারাঙ্গনার উল্লেখ নিশ্চই ভুলে যান নি কেউ। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ এখন থাক।

তোবড়ানো ঝুপড়ির পাশে বসে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছিলেন তিনি। ভাতে-মদে-অনিয়মে হতশ্রী প্রাচীন শরীরের যত্রতত্র মেচেতার দাগ। গল্পের খোঁজে গেছি শুনে তাচ্ছিল্যের নজর হানলেন প্রথমে, তারপরেই মাথার ওপর দড়িতে মেলা নাতনির ভেজা অন্তর্বাসের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গতর থাকলে আজ তাঁর সামনে কত পুরুষের ছোঁকছোঁক করার কথা অথচ ফালতু কারণে দিদিমণিরা এসে নানান জেরায় জেরবার করে। তবে কেউ গল্প শুনতে এসেছে এমনটা মনে করতে পারলেন না।

ভাল কথা বলার অভ্যেস বিশেষ নেই, খাপছাড়া দায়সারা গল্পটি শুনতে শুনতে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম প্রিয়গঞ্জ কলোনি, টিনপাড়া, খালপাড়া বা রূপাজীবা নগরের বাতিল দেহপোজীবিনীদের, ভাত কাপড় বাসস্থান নয়, জীবনের শেষ বেলায় এসে যাদের শুধু নারী শরীরের দাম কমে যাওয়ার অপমান, বিবর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট... এ ও আমার পোড়া ডুয়ার্স!

গল্পটা সাজিয়ে নিতে হয়েছিল। এলোমেলো ফাঁক ভরাট করার পর দাঁড়ালো এইরকম।

রানি আবদার করলেন তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

রাজা বললেন, অমনি অমনি তো আনন্দ-বিহার হয় না। এসো পাশা খেলি। যদি জিততে পারো, নিয়ে যাবো।

রাজা-রানি পাশা খেলতে বসলেন।

রাজা হারলেন। রানি হাসলেন।

পাশা ছেড়ে উঠে সাজঘরে গেলেন। সাজঘরে গিয়ে ডুরে ছাপ পাটানি বুকে বাঁধলেন, অঙ্গবস্ত্র গুছিয়ে কাঁধে ফেললেন। খোঁপা বেঁধে কপালে টিপ পরে চোখে কাজল গায়ে কর্পূর মেখে রথে উঠে রাজার পাশে বসলেন।

রথ চলল বন পথ মেঠোপথ চড়াই উতরাই বেয়ে। রানির মনে খুশি আর ধরে না। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে রাজার হাতে হাত রাখলেন। কাঁধে মাথা রাখলেন।

অনেকটা যাবার পর নগরের একটি বিশেষ পথে চলতে চলতে হঠাৎ রাজা বললেন, আমরা এখন নিষিদ্ধপল্লীর পাশ দিয়ে চলেছি। তুমি ওদিকে তাকিয়োনা।

রাজা বারণ করলেন। রানি কৌতুহলী হলেন।

তাঁর খুব জানতে ইচ্ছে করল কেন ওদিকে তাকানো যাবে না। রাজার নজর বাঁচিয়ে আড়ে আড়ে সেদিকে তাকিয়েই ফেললেন। আর তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভাঙা পাঁচিল ঘেরা একটি জায়গা, জায়গায় জায়গায় ফাঁকা। তার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সাজগোজ মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কয়েকজন পুরুষ তাদের দরদাম করছে।

রানি বললেন, ওরা দাসী দর করছে তাই না?

রাজার মুখ ভার হল।

রানি বললেন, দাসী কিনবে তো হাটে যাক। ঘেরা জায়গায় আলাদা করে কেনাবেচা করছে কেন?

রাজা আর কী করেন, সত্যিটাই বলে দিলেন। দাসী নয়, ওখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য নারী ভাড়া করা হচ্ছে। প্রমোদ হয়ে গেলে দর মিটিয়ে ছেড়ে দেবে।

তারপর?

তারপর আবার কেউ প্রমোদ করবে। ভাড়া মেটাবে।

রানির রাগ হল। এ কেমন অনাচার? দর মিটিয়ে আমোদ হয় নাকি? পুরুষগুলিই বা কেমন, পছন্দ হলে ঘরে নিয়ে যাক। সারাজীবন দাসী রাখুক, অমন হাতে হাতে মেয়ে বদলায় নাকি?

রাজা বললেন, এইজন্য তোমাকে বারণ করেছিলাম ওদিকে তাকিয়ো না। তুমি শুনলে না।

রাজা রাগ করলেন। রানি রাগ করলেন।

তক্ষুনি সারথিকে হুকুম করলেন, রথ থামাও আমি নামব।

রাজা কিছু বলার আগেই রানি রথ থেকে নেমে ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন সেই পল্লীর দিকে। দু'দিক থেকে পাঁচিল এসে মিশেছে একটা দরজার ডাইনে বাঁয়ে। রানি দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটি মুসকো মতো লোক তাঁর হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল।

রানির গায়ে দামি শাড়ি গয়নার জাঁক দেখে সকলে হাঁ হয়ে রইল।

ততক্ষণে রাজার সম্বিত ফিরেছে। তিনি তরোয়াল বাগিয়ে ছুটে গেলেন পল্লীর দরজায়। তাঁকে দেখেই টনক নড়ল সবার। কে পায়ে পড়বে, কে ধুলো চাটবে তার জন্য হুড়োহুড়ি।

এর মধ্যে এক মুখিয়া এসে আর্জি জানাল, আমরা না থাকলে এই কু-পুরুষের দল আপনার প্রজাদের ঘরে হানা দেবে রানিমা। আমাদের তুলে দেবেন না, জলচল বন্ধ করবেন না দয়া করে।

রাজা শুনলেন। রানি বললেন, মহারাজ এরা বড় দুখী।

এই অবধি বলতে পেরেছিলেন তিনি। বাকি অংশটি অনুমান করেছি, রাজা নিশ্চই সেই মুখিয়ার আর্জি মঞ্জুর করেছিলেন। হয়ত তখন থেকেই নগরবধূদের জন্য আলাদা বসতের ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্মান হয়ত পায় নি কিন্তু পেটেভাতে মরতে হয় নি তাদের।

অনুমান করে গল্পটির ইতি টানলাম বলে পাঠক মার্জনা করবেন, যদিও তার জন্য মাথার দিব্যি দিচ্ছি না মোটেও।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

চিসাং

শ্বেতা সরখেল

হিমালয়ান ব্ল্যাক-বিয়ার! ওয়াইল্ড ক্যাট! না না চমকাবেন না। দেখি নি। কিন্তু তাদের ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে এলাম এই কয়েকটা দিন আগেই। চিসাং নাম তার। পাহাড়ি এই নিষ্পাপ নাবালিকার কোলে মাথা পেতে ঘুমিয়ে এলাম দু'দিন। এমন শান্তি কতদিন আগে পেয়েছিলাম মনে নেই।

'তোদে' যেতে হলে ঝালং-এ পৌঁছে প্যারেনের রাস্তা ধরতে হয়। আর জলপাইগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি, গোরুমারা আর চাপড়ামারি এই তিনটে ফরেস্ট পেরিয়ে রবার বনের মধ্যে দিয়ে ঝালং-বিন্দুতে হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেও তাকে উপেক্ষা করে ঝালং মোড় থেকে 'তোদে'র রাস্তা ধরতে হয়। ঠিক যে জায়গা থেকে সোজা বেরিয়ে গেল তোদে যাওয়া যাবে ঠিক সেই ক্লিভেজে দাঁড়ালেই দেখা যাবে বোর্ডে লেখা আছে 'ওয়াইল্ড উড রিট্রিট'। তারপাশে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া আছে যাওয়ার রাস্তার হদিশ। বাঁ দিক দিয়ে আমরা খাড়া ওপরে উঠে গেলাম সেই পথ ধরে। একটু উঠেই আবার বাঁয়ে খোঁপার কাঁটার মত ইউ টার্ন। আবার ডানদিক, তারপর আবার বাঁ। পৌঁছে গিয়ে দেখলাম এমন এক থাকার জায়গা এখানে থাকতে পারে তা একটু আগে পর্যন্তও কেউ ভাবতে পারবে না। অপূর্ব সুন্দর এক হোমস্টে। বড় স্পেসে গাড়ি রেখে নামতেই বাড়ি কর্ত্রী একটি সুন্দর সাজানো থালায় করে প্রত্যেকের জন্য খাদা নিয়ে এসে হাসি মুখে তা পরিয়ে দিলেন আমাদের গলায়। হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন এমনভাবে যেন কতই কৃতজ্ঞ। বাঁশের তৈরি বেঞ্চে বসে চা খেয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর তো নয় যেন দামি হোটেলে থাকতে এসেছি। কোথাও কোন বিলাসিতার বাহুল্য নেই ঠিকই কিন্তু পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের উপস্থিতি যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই। দেওয়ালের রঙগুলোও যেন মনে হচ্ছে সদ্য করা। ছোট ছোট জানালাগুলোয় সাদা নেটের ডিজাইন করা আধ-পর্দা আর রাতে ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে রয়েছে ডার্ক পার্পল কালারের বড় ঝোলানো ফুল পর্দা। মেঝেতে কার্পেট তো বটেই, বারান্দায় পাতা রয়েছে ফলস্ গ্রাসের শিট। আসলে এর বয়সটাও যে বেশি নয় সেটা অবশ্যই একটা কারণ, কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক বাড়ির প্রধান তিনজন ছাড়াও আরও দু'একজন আছেন যাঁদের দেখতে পেলাম প্রতিনিয়ত লেগে রয়েছেন ঘরবাড়ি পরিষ্কারের কাজে। এরকম জায়গার একটি বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন থাকবে আমার ভাবনার বাইরে ছিল। কারণ আমার আগেকার দেখা হোমস্টেগুলোর সঙ্গে একে ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। থোরা হাটকে।

দুপুরে লাঞ্চে বসেছি। অনেক পদের সঙ্গে একটা প্লেটে বেশ খানিকটা কালো কালো ভাজা মত যেন একটা কী! আমরা চারজন ছিলাম। তিনজনেই ওটা টেস্ট করতে চাইল না। কারণ ওরা তেতো খেতে ভালবাসে না। আমি আবার প্রথম পাতে একটু তেতো পেলে ভালই খাই। জানলাম ওটা তেতো পদ। তার নাম 'নাকিমা'। কেমন যেন ছোট ছোট ফলের মত জিনিস নরম নরম করে ভাজা। আমি খেতে গিয়ে বুঝলাম কী অপূর্ব তার স্বাদ! না খেলে অজানাই থেকে যেত। কাঁচা 'নাকিমা' দেখলাম ঝুড়িতে রাখা। এটা এখানকার স্পেশাল আইটেম। পরদিনকার লাঞ্চে পেয়েছিলাম স্কোয়াশের শাক। কী চমৎকার করে যে রেঁধেছে! তবে হ্যাঁ, সব পদই যে আমাদের বাঙ্গালিদের মত রসিয়ে কষিয়ে রান্না করা তা নয়, যত্ন আর পরিপাটি মিলে গরম গরম খাবার যে আমাদের ভালই লেগেছে তা কিন্তু সত্যি। চিকেনের ঝোল আর ডিমের ঝোলে খুব কিছু অদলবদল বুঝলাম না। তবে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভাল, কেননা তেলের মাত্রা যৎসামান্য।

পরদিন সক্কাল সক্কাল ঘুম থেকে উঠে পাখির পেছনে ছুটল আমার কত্তাটি। বাড়ির সীমানার আশপাশ দিয়েই বড় বড় সব গাছে কত বিচিত্র

চিসাং হোমস্টে। ৮৯০০৩৭০৮০১, ৮২৫০৩১৭৫১১
ওয়েবসাইট www.chisanghomestay.com

রকমের যে পাখি! আমার তো চোখ প্রায় ছানা বড়া। বাইনোকুলার নিয়ে আমিও রেডি। পাখি দেখলেই ক্যামেরায় বন্দী করতে বলতে হবে। লাল, নীল, হলুদে কী বিচিত্র রূপ যে তাদের! 'রংরুট'এর 'পাখি' বই সঙ্গে ছিলই। ফলে ছবি তুলেই আইডেন্টিফিকেশনে লেগে পড়ল বাপ-ব্যাটা-বেটি। লাল রঙের স্কারলেট মিনিভেট মেল। হলদে রঙের স্কারলেট মিনিভেট ফিমেল আর নীল রঙের ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, যেন পোজ দিয়ে ক্যামেরার সামনে বসছে এসে। উফ্ সে কী দৃশ্য! আমাদের রুমের সামনেই একটা গাছ আছে, জানলাম তার নাম ঘুরপিস। সেখানে যে ফল হয় তাতে খুব মধু হয়। কড়া শীতের সময় ভুটান পাহাড়ে যখন খুব ঠান্ডা পড়ে তখন অনেক পাখি নেমে আসে এই গাছে। একদিকে যেমন ঠান্ডা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আর অন্যদিকে মধুর লোভে লোভে। এই সময় নানান জাতের পাখিতে নাকি ছেয়ে থাকে ঘুরপিস। আমাদের খুব লোভ হচ্ছিল শুনে, ফের যদি শীতে একবার আসা যায়!

চিসাং-এর মজাটা হল, এই হোমস্টের সামনে দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে সেটা আরও ওপরে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে নেওড়াভ্যালি ফরেস্টের বর্ধিত অংশে। এই জিরো পয়েন্ট খুব বেশি দূর নয় এখান থেকে। সেখানে আছে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ওয়াইল্ড ক্যাট, লেপার্ড এরা। তবে হ্যাঁ এদের দেখতে পাওয়া না পাওয়া মোটেই আমাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। যেমনটা সব ফরেস্টেই হয়। আবার এ-ও ঠিক এখানে নেমে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সন্ধেবেলা বারবি কিউ-এর আয়োজন হল, চিকেন ঝলসানো চলছে আর সেই সঙ্গে চলছে তুমুল দাবা খেলা। একটা ছোট্ট-খাট্টো লাইব্রেরিও আছে সেখানে। যেহেতু এই নিঝুমপুরীতে সময় কাটানোর অসুবিধে হতে পারে তাই এন্টারটেইনমেন্টের সরঞ্জামের অভাব নেই এখানে। দিনে ব্যাডমিন্টন, সন্ধেতে লুডো, দাবা এইসব। ঝলসানো মাংস মুখে দিতে দিতে মিস্টার রাই বললেন, "আমাদের এখান থেকে মাঝে মধ্যে মুরগী তুলে নিয়ে যায় ওয়াইল্ড ক্যাট"। আমি আর আমার পাশে আর এক ভদ্রমহিলা দু'জনে চোখাচোখি করলাম। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু আমাদের এই বাড়িটা ছাড়া। সেই সঙ্গে কুয়াশার চাদরে মুড়ে আছে আশপাশটা। কাল আসাবার পর থেকে এমনই আবহাওয়া চলছে। বেশ ঠান্ডাও। সাড়ে সাতটার মধ্যে সকলে ঘরে চলে এল। আমি আর ওই পাশের গেস্ট ভদ্রমহিলা টুকটাক গল্প করতে লাগলাম ওখানে বসেই। হালকা আলোতে বেশ লাগছিল। কেমন যেন একটা গা ছমছমে পরিবেশ। গল্প করতে করতে হঠাৎ ঝুপ্‌ঝাপ্ করে একটা আওয়াজ, স্পষ্ট দেখলাম কী যেন একটা লাফিয়ে পড়ল। 'বাপ্‌রে' বলে আমরা দু'জন তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম সেফ জোনে মানে ঘরের কাছাকাছি। বারবিকিউ-এর ঘরখানা ছিল একটু নিচের দিকে গাছগাছালির মধ্যে। তারপর সীমানা শেষ। আমাদের পালিয়ে আসতে দেখে মালকিন ভদ্রমহিলা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্বামীর মত ভঙ্গিতেই জানালেন, "ওয়াইল্ড ক্যাট এসে মাঝে মাঝে মুরগী তুলে নিয়ে যায়"। দ্বিতীয়বার এই একই কথা শুনে আমরা ফ্যাকাশে মুখে গুটিগুটি যে যার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। আজও জানি না কী দেখেছিলাম।

অনেকটা নিচের দিকে তাকাতে দেখা গেল ভুটান আর ইন্ডিয়ান আর্মির পাশাপাশি বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান। ভাল লাগল দেখে। চিসাং এর কাছাকাছি একটি নদী আছে, দাওয়াখোলা। সেখানকার জল খেলে নাকি অনেক রকম অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে স্কিনের সমস্যা থেকে। রাস্তা খুব খারাপ শুনে আমরা আর যাওয়ার চেষ্টা করিনি এ যাত্রায়। তবে গা ছমছমে নির্জনতা এতটাই উপভোগ করেছি যে বারবার পাহাড়কে ভালবাসতে ইচ্ছে করেছে। আর তারই টানে এবারে চিসাং-এ এসে নিংড়ে নিয়েছি সেই ভালবাসার নৈশব্দের গুমোর। নিজের একটা বাড়ি আছে ভাবতেই ইচ্ছে করছিল না এই দুটোদিন। ফেরার দিন যথারীতি মনখারাপ। সি অফ করলেন বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য একুশ বছরের অ্যান্ড্রোনিকাস। খাদা পরিয়ে নমস্কার করলেন। অনেক শুভেচ্ছা আর ভালবাসা ভরা কথায় মনে হচ্ছিল এ যেন আত্মীয় বিচ্ছেদ। বেশিরভাগ হোমস্টেতেই এই একই অভিজ্ঞতা হয়। এবারেও হল। আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলাম জলপাইগুড়িতে নিজের ডেরায়। অনেকদিন ধরে মনের আনাচে-কানাচে ঘোরা ফেরা করতে থাকে এঁদের স্মৃতি।

ছবি ঃ অতনু সরখেল

বউ সাথে পথে পথে। পর্ব-৬

চিলাপাতা থেকে দিনহাটা

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

পানিয়ালগুড়ি, সিকিয়াঝোড়া, স্বর্গছেঁড়া, গদাধরবীট, জঙ্গল, চা-বাগান, বনবস্তি, বৃক্ষরাজি, নির্জন বনতলী দিয়ে ২৩ মাইল ওয়াচ টাওয়ারে কর্তা-গিন্নি হাজির হলাম। বাচ্চাকাচ্চা সহ হাতির পাল বিকেল বেলাতেই উপস্থিত। তারপর চমৎকার দৃশ্য অপলক চোখে দেখা। হস্তিশাবককে শাসন, আদর, ভালবাসা, অতবড় দেহ নিয়ে জলেকাদায় এপাশ-ওপাশ, বন দপ্তর থেকে প্রদত্ত খাদ্যবস্তু নিমেষে সাবার। মাঝে মাঝে শুঁড়ে শুঁড়ে লড়াই, ধক্কাধাক্কি, শুঁড় দিয়ে জল ছেটানো, ভয়ংকর বৃংহন। জীবনে এসব দৃশ্যের সাক্ষ্য বড় একটা হয় না। অনেক বছর আগে গরুমারা জঙ্গলে সারা রাত জেগেছিলাম গরাতি ওয়াচ টাওয়ারে। জলদাপাড়া জঙ্গলে মাচার উপরে রাত কাটানো শিলতোর্ষায় অ্যান্টি পোচিং ক্যাম্পে। ওখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল ছোট ঘরে। লোকজন বলতে সম্মুখে মাহুত, বনরক্ষীদের কাঠের দোতালা। তেইশ মাইল ওয়াচ টাওয়ার, গরাতি, তন্ডু নজরমিনারে মিয়া-বিবির উপস্থিতি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। আজ শুধুই স্মৃতির রোমন্থন জাবরকাটা। বন দপ্তরের অনেক বিধিনিষেধ এখন। সেলিব্রেটি ভিআইপি হোমরাচোমরাদের কথা অবশ্য আলাদা।

নিজ বাসভূমি শিলিগুড়ির পর উত্তরবঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক হল আলিপুরদুয়ার। এত বেশি আপন জন, পরিচিত মানুষজন যার সীমা-পরিসীমা নাই। এমনি অবস্থা লাটাগুড়ি, হাতিপোতা, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া। আলিপুরদুয়ারের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আবারও কলমের ডগায় চলে আসে। ক'দিন আগে হঠাৎ ফোন জয়ন্তী চা-বাগানের উত্তমের। —ও গৌরীদা এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কথা বলুন। কণ্ঠস্বর গৌতমের, আমার ছোঁয়াচে রোগে সেও আক্রান্ত। বললাম— 'ঘুরে বেড়াও ভাই'। 'গৌরীদা হাতিপোতায় এসে আপনার কথা হচ্ছে। আপনার চরণরেখা ধরে চলেছি ডুয়ার্সের চা-বাগানে।

একবার বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছি। দু'জনে টাউন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠব। ট্রেন ঢুকলে কামরায় ঢুকে জায়গা নিয়ে বসি। হঠাৎ দেখি অনেক কালের চেনামুখ আমার মুখোমুখি। আমার চিনতে অসুবিধা হয় না। জিজ্ঞাসা করলাম— শক্তিবাবু না? পরমাণু, মাউন্টেন ডেসপ্যাচের অধ্যাপক শক্তিপদ ঘোষ। উনি বললেন, 'আমি ঠিক আপনাকে চিনতে পারলাম না। বললাম— গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। শুনেই যেন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন। —'ও মাই গড। আসলে কয়েক যুগ পর মুখোমুখি তো তাই রিকালেক্ট করতে পারি নি। ডোন্ট মাইন্ড, কেমন আছেন বলুন?' আমি বললাম— ভাল। স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বললেন ভাল নেই। শারীরিক, মানসিক দুই। আসলে কী জানেন গৌরীবাবু, সংসার সত্যি বড় অসার বস্তু। আপনি তো জানেন কী পরিশ্রম করতাম। তখন শিলিগুড়ি এলে সেবক হোটেলে উঠতাম। পরমাণু, মাউন্টেন ডেসপ্যাচকে ঘিরে কত উন্মাদনা। মিহির লাহিড়ী, অর্ণব সেন, জগন্নাথদা, তিনুদা, বেণুদা, সুধীর বিষ্ণু অনেকের কথা উঠে এল। মিহিরের আত্মহত্যা। মিহির পড়াতো আলিপুরদুয়ার কলেজে দর্শন বিভাগে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন জংশনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দশটা। পরে দেখা হবে বলে উনি গুটি গুটি পায়ে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বিদায় নিলেন। আর দেখা হয় নাই। আলিপুরদুয়ার লেবুবাগানের বাড়িতে এক-দু'বার গেছি আড্ডা মারতে। হয়ত এখন আর ইহলোকে নাই। আলিপুরদুয়ারের প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক। মেন্দাবাড়ির গল্প শোনাই।

মেন্দাবাড়ি প্রথম দর্শন কয়েক দশক আগে। সঙ্গী ছিলেন দুয়ারের প্রণবেশদা। তার কর্মস্থল তখন চিলাপাতায়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আলিপুরদুয়ারের চারুমুদ্রণের খোকনের সঙ্গে আড্ডা মারছি। হঠাৎ খোকন বলে, 'দুপুরে কী করেন মানে খাওয়াদাওয়ার পর?

—একটু ভাত ঘুম।

—চলুন ঘুরে আসি। বন্ধু তীর্থঙ্কর আসছে গাড়ি নিয়ে। স্রেফ সারাটা দিন মানে দুপুর থেকে বিকেল মেন্দাবাড়ি চিলাপাতায় একটু চক্কর দেব। গাছপালা, বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় হবে।

বললাম— আলবাৎ যাব।

খোকনের ভাষায়— রোদ জ্যোৎস্নায় মেন্দাবাড়ি। বেরিয়ে পড়ি তীর্থঙ্করের গাড়িতে। সবে বনমন্ত্রী ফিতে কেটেছেন মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্পের। খোকন আপাদমস্তক কবি ও সাংবাদিকও বটে। সে যাই হোক আজ শুধু বেড়ানোর গল্প— চোখ মেলে দেখার আনন্দ। লেবু বাগান থেকে যেন ডানা মেনে উড়ে চলা। তীর্থঙ্করের স্টিয়ারিংয়ে আঙুল। গাইছে— 'গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর।... ১৯২৫ সালের কাঠের বনবাংলো নেই। নতুন রূপে তৈরি হয়েছে। পুরাতনের প্রতি আমার টান একটু বেশি। বনসুরক্ষা কমিটির বাদল বসুমাতারির সঙ্গে বসে খোকন সাক্ষাৎকার নিল খবরের কাগজের জন্য। কত স্মৃতি খোকনকে ঘিরে। অকালে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল চিরকালের মতন।

মেন্দাবাড়িতে আবার দল বেঁধে বেড়ানো মানে স্ত্রী, শালীর ছেলে মেয়ে। সেই সঙ্গে নোনাইয়ের হারাধন পাল যুক্ত হল। গাড়ি নিয়ে আমরা হই হই করে হাইওয়ে হয়ে মেন্দাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প। আগেই বলেছি এই বনবাংলোর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে। আধুনিকীকরণ হলেও মনে কোনও দাগ কাটে না। প্রবেশ পথে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক থেকে উদ্ধৃতি টাঙানো। বনজঙ্গল এককথায় প্রকৃতিকে তিনি উপাসনা করতেন। আমার প্রিয় লেখক। ঘনজঙ্গল এখন মেন্দাবাড়িতে কমে এসেছে। তবে হোমস্টের প্রসার ও জনপ্রিয়তা দিনকে দিন বাড়ছে। দূর দূরান্ত থেকে লোকজন মেন্দাবাড়িতে বেড়াতে আসছেন এবং রাত্রি যাপন করছেন। মেন্দাবাড়ি থেকে অরণ্য, নদী, ঝোরা, খোলা, চমৎকার নজরমিনার এবং অরণ্য বেষ্টিত সড়ক হাসিমারা-কোচবিহার এথকে নানা ধরনের যানবাহন অবিরাম আসা যাওয়া করছে। মেন্দাবাড়ি নজরমিনারে রংবেরঙের প্রজাপতির মেলা। চোখে, মাথায় এমনকি গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। ওদের রঙিন পাখার মৃদু কম্পন দেখে আনন্দ জাগে।

সারাদিন মেন্দাবাড়িতে কাটিয়ে চলে আসি নিমতি ধাবাতে। চব্বিশ ঘণ্টা ধাবাতে ভিড় বিশেষ করে ভুটানের যাবতীয় গাড়ি আসা-যাওয়ার পথে এখানে দাঁড়ায়। থিম্পু, পুনাখা কিম্বা ফুন্টশেলিং থেকে অসমের সামদ্রুপঝঙ্কার, গেলামফু, টংসা যেতে হলে এই পথে অনেকে যাতায়াত করে। যাই হোক তন্দুরি, তরকা, লাড্ডু, প্যাড়া খেয়ে দু'চক্কর দিই ইস্টিকুটুমে। অতিথিদের ভিড়ে বাপির ইস্টিকুটুম জমজমাট। ইস্টিকুটুম থেকে পাটকাপাড়া চা-বাগান, ঘাঘরা, রাখালের মাঠ হয়ে আলিপুরদুয়ার।

আলিপুরদুয়ারে দিন কয়েক কাটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে চলে যাই সোনাপুর হয়ে চিলাপাতা জঙ্গলে। পঞ্চাশ বছর কী ভাবে নিমেষে পার হয়ে গেল ভেবে পাই না। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে সে সময় ছিল চমৎকার কাঠের বনবাংলো। আশপাশে বনবিভাগের ঘরবাড়ি। হাতে গোনা দু'-একটি দোকানঘর। টুরিস্টদের এতো হামলে পড়া ভিড় ছিল না। জাঙ্গল সাফারি, জিপসিতে চেপে নাচানাচি। বাইসন, হাতি দেখার জন্য আকুলিবিকুলি। চিলাপাতার মুখ্য আকর্ষণ জঙ্গল, নলরাজার গড় নিয়ে নানারকম গালগপ্পো। সেটাই দেখার জন্য যাওয়া কোচবিহার থেকে। অরণ্য সাথী হিসেবে পেয়ে গেলাম প্রণবেশ চৌধুরীকে। শীতের সকালে দু'জনে পায়ে পায়ে দুর্গম দুর্ভেদ্য নির্জন বনতলী দিয়ে নলরাজার গড় দর্শন। ইতিহাস কিংবদন্তীর গল্পগাথার পাঁচমিশালী রসায়ন আজও প্রহেলিকা, রহস্যময় জগত। পরবর্তীকালে বার কয়েক গিন্নিকে নিয়ে যাই। বর্ষায় জোঁক কিলবিল করে। তেমনই ঝিঁঝিঁ পোকাদের ভয়ঙ্কর কীর্তন যা কি না ডিজে বাজনাকে হার মানায়। একবার ছবি তুলতে গিয়ে সারা শরীরে জোঁক লেপটে যায়। তারপর? জামাকাপড় খুলে জোঁক মুক্ত হওয়া। বেত ঝোপে হোঁচট খেয়ে পড়ে রক্তাক্ত হই।

চিলাপাতা এখন পর্যটনের মক্কা। বনবাংলো তো আছেই আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি বুয়া ওরফে গণেশ শাহুর শিবজী লজ। পরে এর নাম হয়েছে চিলাপাতা জঙ্গল ক্যাম্প। প্রথমবার পৌঁছানো গ্রীষ্মের দুপুরে আলিপুরদুয়ারের 'সীমানা ছাড়িয়ে' বিপ্লবের সঙ্গে। —কাকীমা চলেন আমার গাড়িতে। মাধব থেকে দই, রসগোল্লা কেনা হল। বুয়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয়। একদা বুয়ার বাবা চমৎকার প্যাড়া তৈরি করত। তারপর কত পরিবর্তন চিলাপাতায়। মনে পড়ে কোচবিহারের বাবলার কথা। দু'জনে মিলে আন্দু, কুরমাই, বানিয়াবস্তি, ফুলেনের চা দোকানে বসে মাছভাজা, চিঁড়ে-মুড়ি খাওয়া। এখন চিলাপাতায় হোমস্টে চালু হয়ে গেছে। রাভা জনজাতিরাই করছে। এছাড়া রিসর্টের সংখ্যাও

বাড়ছে। নৌকায় তোর্ষায় বেড়ানো। গিন্নি কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। নদীর পারে চমৎকার নজরমিনার মনে পড়ে। সব থেকে স্মরণীয় স্মৃতি দু'জনে ফুটফুটে সাদা জ্যোৎস্নায় কোদালবস্তি নজরমিনারে কাটানো। সম্মুখে তোর্ষা নদী। জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। এক দিব্য অনুভূতি।

চিলাপাতার স্মৃতি নিয়ে সত্যি বলছি বই লেখা যায়। এত আসাযাওয়া। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ির হেল্প টুরিজম বুয়ার সঙ্গে যুক্ত হল। এখন বিচ্ছিন্ন। শরতে, বর্ষার সময় চিলাপাতা অসম্ভব সুন্দর। চারিদিক সবুজে সবুজ। ধান পাকলে হাতিদের আনন্দ দেখে কে! গিন্নিকে নিয়ে কতবার এসে থেকেছি বুয়াদের আতিথ্য ভোলার নয়। লং জার্নির কৃষ্ণেন্দুর অসাধারণ ব্যাম্বু ভিলেজ। কী সুন্দর নান্দনিক শৈল্পিক ভাবনা চিন্তা বাঁশের উপাদান দিয়ে তৈরি পর্যটন আবাস। সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল তেঁতুলতলা। এখানে মাঝে মাঝে উত্তরের কবিতা গল্প পাঠের আসর বসত। কেন যে কৃষ্ণেন্দু সংস্থাটি বিক্রি করে দিল জানা নেই। কয়েকদিন আগে হঠাৎ দেখা নেতাজি কেবিনে। বললাম— পত্রিকা, ব্যাম্বু ভিলেজ বন্ধ করে দিলে?

উত্তর দিল— উপায় নেই দাদা। প্রচুর ব্যয়। আয়ের চেয়ে খরচ বেশি। বহুল প্রচারিত লং জার্নি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মন খারাপ হয়েছিল এবং বেশি করে ব্যাম্বু ভিলেজ। শীত উৎসব, গদ্য-পদ্যের আসর। সস্ত্রীক কতবার এসে থেকেছি ব্যাম্বু ভিলেজে। বাড়ি ফেরার সময় শাক-সবজি, কাঁচা পাকা কাঁঠাল নিয়ে শিলিগুড়ি ফেরা। এসব কি ভোলা যায় না ভুলতে পারি! স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক গৌতমবাবুর পরিচালনায় 'মনের মানুষ'-এর সুটিং বুয়াদের লজে এবং লাগোয়া বানিয়া জঙ্গলে হয়েছিল। সে এক হইহই রইরই ব্যাপার। চিলাপাতার কাছে মথুরাপুর চা-বাগান। সোমবার দিন চা-বাগানকে ঘিরে জমজমাট। হাটবাবু সেজে দু'জনায় ঘুরে বেড়াই। যত না কেনা তার চেয়ে দেখার আনন্দ শতগুণ। চিলাপাতার সঙ্গে আমাদের দু'জনের যে কী প্রাণের সম্পর্ক তা বলে বোঝাতে পারব না।

চিলাপাতা থেকে দু'জনে গাড়ি করে বেড়াতে গেছি মধুপুর ধাম। শঙ্করদেব স্মৃতিবিজড়িত ধাম। অসমীয়াদের কাছে বড় পবিত্র। মধুপুর থেকে ঢাংটিংগুড়ি, শুটিং ক্যাম্প, ছাগলের বের, রসমতী, পাতলাখাওয়া জঙ্গলে। রাজার আমলের আরণ্যক সৌন্দর্য এখন নেই। তবু যেটুকু অবশিষ্ট তাতেই তুষ্ট। শোনা কথা পাতলাখাওয়াতে নাকি গন্ডার আনা হবে। মন চাইলে থাকতে পারেন রসমতীতে। আমরা চলে গেছি কোচবিহারে মৎস্য দপ্তরের রাজদরবারে। ব্যবস্থা করে রেখেছিল বাবলা। একদিন রাতে ডা. ব্রহ্ম পরিবারে আড্ডা খাওয়াদাওয়া। কোচবিহারে যাদের সঙ্গে আড্ডা হত তাদের অনেকেই বিদায় নিয়েছেন আবার কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন, চুপচাপ। গোপেশবাবু, নীরজবাবু, ক্ষুদিরাম রাউত, জীবতোষ, একটু দূরে হাওয়ার গাড়ির অরুণেশ ঘোষ। মড়াপোড়া দিঘি ত্রিবৃত্ত সরণি। রণজিৎ দেবের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয়। রবীন্দ্রপল্লীর সমীর। তমসুকের সম্পাদক। কতকাল দেখা নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শেষ দেখা ধূপগুড়ির কৃষ্ণপ্রিয়র বাড়িতে। পাশাপাশি বসে ভোজন। এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব বড় বেদনার। কেন এমন হল জানি না। সাগরদিঘির

পাড়ে বসে সহধর্মিনীকে শোনাই পুরনো সেই দিনের কথা। একবার জ্যোতির্ময়ের বাড়ি (রানির বাগানে) তে ছিলাম। পাগমার্কের অরূপ গুহর কথা মনে পড়ে। বিশ্বসিংহ রোডে 'প্রণতির' বাপি। রাজার শহর হোক, বনেদিয়ানা হোক, সর্বত্র যা চিত্র কোচবিহার তা থেকে মুক্ত নয় তা হল জঞ্জাল, জ্যামজট, টোটোদের দৌরাত্ম। বাস আড্ডাতে দাঁড়ানো যায় না। এত ভিড়, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, বত্রিশ ভাজা। অসহ্য নরক যন্ত্রণা।

বছর তিরিশ আগে তেজপুর থেকে বাসে আলিপুরদুয়ার সস্ত্রীক ফিরছি। কন্ডাক্টর মধ্যরাতে নামিয়ে দেয় কোচবিহার বাস আড্ডায়। একেবারে শুনশান। শেয়ালের ডাক। আর সেই হুংকার জাগতে রহো। মিয়াবিবির বুক ধরাস ধরাস।

কোচবিহারে থাকাখাওয়া এবং হেথাহোথা পরিক্রমা সস্ত্রীক কিংবা একলা হয় হোটেলে, জেলা পরিষদের বাংলো, পান্থনিবাস, অতিথি নিবাস নচেৎ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের বাড়িতে কাটানো। কোচবিহার রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, ঐতিহ্যমন্ডিত ঘরবাড়ি এখনও চোখে পড়ে। রাসমেলা, ভেটাগুড়ির জিলিপি, ঢাকাই পরোটা। তবে কৃত্রিমতা ছেয়ে গেছে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নেই। এক সময়ে গোপেশ দত্তর বাড়িতে উঠতাম। ওনার সরকারি আবাসনে অনেকেই আসতেন। স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করা কঠিন। মনে পড়ে নব্বইয়ের দশকে তিস্তা টি টুরিজমের কী আনন্দ উল্লাস। জংশন থেকে রেলে চেপে কোচবিহার। রাজপ্রাসাদের মাঠে কত বক্তৃতা, ভাওয়াই গান, পর্যটনের বন্যা বইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সেসব এখন ধূসর স্মৃতি। তবে মেঘলা আকাশের আফছারউদ্দিনকে মনে পড়ে। হাজরা পাড়ার নৃপেন পাল এবং ব্যাঙচাতরার বিশ্বনাথ। ওর একটি বইয়ের দোকান ছিল। পুরাতন মন্দির লোকসংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করত। কে বা কোথায় এখন। একপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

বছর দুই আগে কোচবিহার থেকে গুবরে পোকার মত দেখতে ন্যানো গাড়িতে চেপে দিনহাটা হয়ে দেখতে যাই গোসানিমারী মন্দির রাজপাট। বছর পঞ্চাশ আগে প্রথম দেখার স্মৃতি এখনও টাটকা হলেও পরিবর্তনের ঢেউয়ে বিস্তর ফারাক। দিনহাটা শহরটারই কত পরিবর্তন। প্রথমদিকে দিনহাটায় গেলে আমি থাকতাম সিনেমাহলের পেছনে হাসপাতালের কাছে একজনের সাথে। সে ছিল কম্পাউন্ডার কিন্তু স্বভাবে জীবনযাপনে পুরোদস্তুর সাধু প্রকৃতির। কট্টর নিরামিষাশী আর আমি সর্বভুক। সে খেত আতপ চাল, ঘি, আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ এইসব। রাত্রে দুধ-রুটি ব্যস। আমি খেতে যেতাম হোটেল সীলর্ডে আর সন্ধ্যা হলে পাল সুইটসের চা-সিঙ্গারা।

দিনহাটার রংপুর রোড থেকে ডান দিকে গোঁসানিমারী মন্দির, সিতাইয়ের পথ। প্যাটলা, আলোকঝারি, মশানপাট, তারপর গ্রামগঞ্জ পাটখেত, বাঁশ ঝাড়, তামাক পাতার গন্ধ। মনে পড়ে ঝাপরা ডালপালা মেলা মহাস্থবরি বটবৃক্ষের কথা। এখন সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়। কিছুই চেনা যায় না। দিনহাটার স্বপ্ননীড় বড়নাচিনা, গোসানিমারী রোডের রমেন্দ্রনারায়ণ দে চিঠিপত্র, সাপ্তাহিক সাহিত্য সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠাতেন। অনেক পরে জানতে পারি ধূপগুড়ির অমিতের পিতৃদেব। প্রায়শই চিঠিতে লিখতেন একবার আসুন। আপনাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। আমার যাওয়া হয় নি। তবে গেছিলাম সস্ত্রীক হিতেন নাগের বাড়িতে। কয়েক ঘণ্টা গপ্পোসপ্পো। ওনার সুসজ্জিত বইয়ের সম্ভার দেখে মুগ্ধ হই। দেখতে যাই রাজপাট। সত্যি কথা বলতে কী স্থানীয় মানুষজন ভীষণ উদাসীন, তেমনই সরকার। প্রস্তর মূর্তিগুলো গেল কই? পাশেই সংগ্রহশালা, সেটি ধুলো জমে বন্ধ। একজন বলে, কী ছাতার দেখার আছে। এখানে আসে প্রেমিক-প্রেমিকারা আর তামাক পাতা শুকানো। গিন্নিকে বললাম— আমরাও গান গাই— প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে। সঙ্গে কে ছিল মনে নেই, হাসতে হাসতে রাজপাটে শুয়ে পড়ে। —সত্যি গৌরীদা আপনার জবাব নেই। বুড়ো হাড়ের ভেল্কি বুড়ো বয়সে জোর করে নাচিয়েছিল জার্মানির স্টিফেন লুজে, রাজেন বালি, অরুণাভ। বাঃ গৌরীদা তো ভালই নাচেন। ভাগ্যিস সে সময় স্মার্ট ফোন ছিল না, না হলে ভাইরাল হত। দুঃখ হয় পর্যটনে দিনহাটা সত্যি উপেক্ষিত। এসব নিয়ে ভেবে লাভ লোকশানের অনেকে হিসেব কষে। দিনহাটায় সাহিত্যপ্রেমী, লিটল ম্যাগের কবিরা আছেন। দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয় নি। আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবে স্নেহভাজন প্রদোষ, অমিত। যাইহোক ঝটপট ঘুরে বেড়িয়ে চলে আসি চিলাপাতায়। তখন রীতিমত রাত। ঝিঁঝির ডাক। বাঁকা চাঁদ আকাশে। অখণ্ড শান্ত নীরবতার মাঝে বুয়া আমাদের প্রতীক্ষায়।

(চলবে)

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

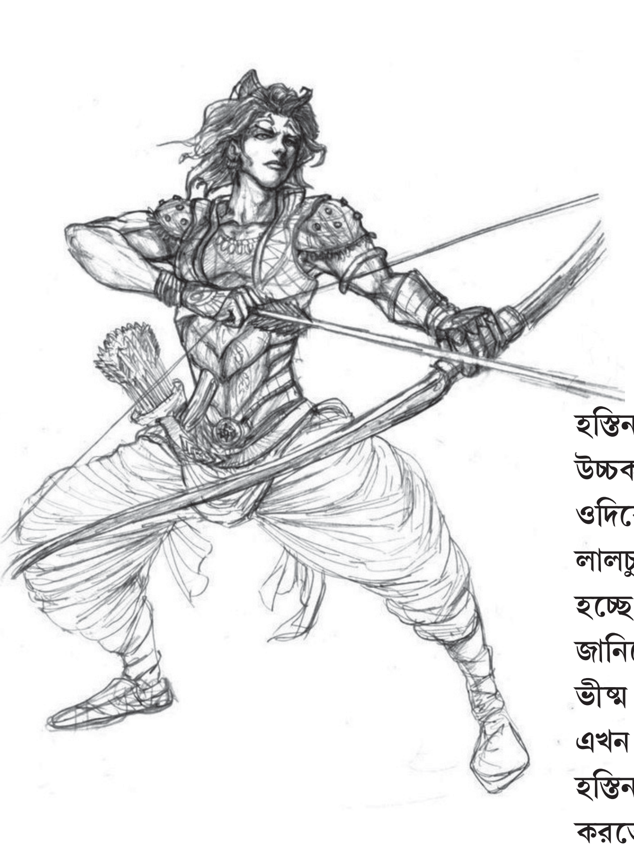

হস্তিনাপুরে একজনকে বেশ ভাল লাগছে ভুসুকু। সে হল রথচালক উচ্চকপালের মেয়ে মধুক্ষরা। তাঁকে সব কথা খুলেও বলেছে ভুসুকু। ওদিকে দুর্যোধনের ডাকে অঙ্গদেশ থেকে ছুটে এসেছেন কর্ণ। তবে, লালচুলো পুন্ডরীকাক্ষের সঙ্গে দুর্যোধনের মাখামাখিটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না গান্ধারীর। বড় খোকাকে তিনি সে বিষয়ে নিজের বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন। এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে কর্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন ভীষ্ম। কর্ণের শরক্ষেপণের কৌশল দেখে সে ব্যবসায়ী বাক্যহারা। এখন প্রশ্ন হল, কর্ণ-দুর্যোধন-পুন্ডরীকাক্ষ— এই তিনের মৈত্রী কি হস্তিনাপুরে ঐতিহ্যের পক্ষে বিপদজনক? এই তিন শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে কে?

১৭

বিকেলের দিকে ধৃতরাষ্ট্র নগরের তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা কোন খাতে বইছে, তা বোঝার চেষ্টা করেন। ‘সাধুসঙ্ঘ’-এর তরুণ সভ্যরা আজ তাঁদের রাজার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মুনিও আছেন। তাঁর নাম বৃহস্পতি। ধৃতরাষ্ট্র জেনেছেন যে বৃহস্পতি অতি তার্কিক একজন নবীন যুবক। নগরীর অনেক তর্কবিশারদকে তিনি বিচ্ছিরিভাবে তর্কে পরাজিত করে সম্প্রতি বিখ্যাত হয়েছেন। তর্কবিদ্যায় ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার মন্দ নয়, কিন্তু অনুচরদের কাছে বৃহস্পতির তর্ক করার দক্ষতা বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর তিনি ঠিক করেছেন যে যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে সভায় বসবেন। নবীনের সঙ্গে নবীনের তর্ক হওয়াই শ্রেয়।

উপস্থিত নবীনদের নানা রকম চিন্তা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর এক সময় বৃহস্পতির নাম ডাকা হল। ধৃতরাষ্ট্র একটু নড়েচড়ে বসলেন। আড় চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে বেশ ভাবলেশহীন মুখে বৃহস্পতির দিকে চেয়ে আছে। বৃহস্পতির চেহারাটা বলার মত কিছু নয়। আজকাল নগরীর নবীন ছোকরার দল লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি-গোঁফ রাখতে শিখেছে। এটাই নাকি চলছে এখন। বৃহস্পতি সেদিকে যায় নি। তাঁর চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখমন্ডল উত্তম রূপে কামান। চোখের বর্ণ সামান্য লোহিত। সোমরস পান করে এসেছে কি না কে জানে!

বৃহস্পতি সামনে এসে নমস্কার জানিয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যসচিবকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, ‘এ ছোকরা কি রাজকীয় ভাতা পায়?’

‘না। ভাতা কেবল বেদোন্নতির জন্য বরাদ্দ। এ ছোকরা বেদ মানে না।’

‘বাজে নিয়ম। মানুক বা না মানুক— ভাতা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।’

‘আজ্ঞে সামনের মাস থেকে দিয়ে দেব।’

ধৃতরাষ্ট্র এবার বৃহস্পতির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার বক্তব্য শুরু কর বাছা। শুনেছি তুমি নাকি নাস্তিক?’

‘শুধু তাই নয় মহারাজ! আমি ইশ্বর, আত্মা— এসব বিষয়ও মানি না।’

‘কী রকম?’

‘শুনুন রাজন! দেহ হল চারটি ভূতের সমন্বয়ে গঠিত। আপনার অবশ্য বলবেন ভূত পাঁচটি। কিন্তু ব্যোম্‌ নামক ভূতটি আসলে নেই।’

‘না থাকুক ক্ষতি নেই। চারটে থাকলেই যদি হয়ে যায় তবে পাঁচটা কেন লাগবে, তাই না?’

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নটার উদ্দেশ ছিলেন যুধিষ্ঠির। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন।

‘এই ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হলে তার মধ্যে একটি অতিরিক্ত গুণের আবির্ভাব ঘটে। সেই গুণের নাম চৈতন্য। আমার বিশ্বাস, চেতনা মিশ্রিত দেহই হল আত্মা। দেহ নষ্ট হলে আত্মাও নষ্ট হয়ে যায়।’

নবীনদের মধ্য থেকে একজন লাফিয়ে উঠে বলল, ‘আপত্তি জানাচ্ছি। দেহ নষ্ট হলেও আত্মা নষ্ট হয় না। আত্মা অবিনশ্বর। আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুর পর পারলৌকিক কর্ম কেন করি?’

বৃহস্পতি সেই নবীনের দিকে ফিরে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, ‘বলুন তো, কেন করেন?’

‘কারণ আমরা পরলোকগত আত্মার মুখে পিণ্ড পৌঁছে দিই।’

‘পরলোক তো ভিন্ন লোক। ইহলোক থেকে পরলোকে কি খাদ্যপিণ্ড পৌঁছে দেওয়া সম্ভব?’

‘আপনি বালখিল্য প্রশ্ন করছেন বৃহস্পতিবাবু!’ ছোকরা কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। ‘বেদমন্ত্র পাঠ এবং যজ্ঞের মাধ্যমে সহজেই পিণ্ডের লোকান্তরকরণ ঘটে। যজ্ঞের ধোঁয়ায় ভর করে পিণ্ড সোজা ইহলোক থেকে পরলোকে পৌঁছোয়।’

‘আত্মা কি তা খায়?’

যুধিষ্ঠির বিড় বিড় করে ধৃতরাষ্ট্রের কানে কানে বললেন, ‘মোক্ষম প্রশ্ন। এইবার ছোকরা ফাঁদে পড়বে!’

ছোকরা অবশ্য প্রশ্নের কূটত্ব বুঝতে না পেরে গর্বিত স্বরে বলল, ‘খাবে না কেন? সোজা মুখে গিয়ে পড়ে যে!’

‘তাহলে স্বীকার করছেন যে আত্মার খিদে পায়?’

‘ইয়ে মানে— আত্মা তো ক্ষুধাতৃষ্ণার উর্ধ্বে— খিদে পায় না, কিন্তু খায়।’

‘খুব ভাল কথা।’ বৃহস্পতি হাতের দশ আঙুল জড়ো করে মটকালেন একবার। ‘বেদমন্ত্রের দ্বারা যদি ইহলোক থেকে পরলোকে পিণ্ড পাঠান যায় তবে নিশ্চই ইহলোক থেকে ইহলোকেও পাঠান যাবে?’

‘কী বলছেন? পরলোকে পাঠান গেলে ইহলোকে তো যাবেই।’

‘তবে আপনি যদি প্রবাসে থাকেন তা হলে কি এখানে পিণ্ড দান করলে প্রবাসে আপনার পেট

ভরান সম্ভব হবে? যদি হয় তবে প্রবাসে ক্ষুধাতৃষ্ণার সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

ছোকরা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি একজন হস্তিনাদ্রোহী! আপনার উচিত অসুরদের দেশে গিয়ে থাকা!'

যুধিষ্ঠির এবার মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'ছিঃ! তর্কের জবাব তর্কে দেওয়াই সমীচিন। অহেতুক বিতণ্ডা করছ কেন? বেদ না মানলে কেউ হস্তিনাদ্রোহী হয় না। তোমার তো তর্কের ভিত্তিজ্ঞান অবধি নেই!'

ছোকরা মুখে কিছু বলল না। ধৃতরাষ্ট্রকে নমস্কার জানিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল সভা ছেড়ে। বোঝা গেল সে বেশ অসন্তুষ্ট।

'তার্কিক রূপে একদিন তুমি স্বনামধন্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তোমার তর্কশক্তির প্রশংসা করছি বৃহস্পতি।' যুধিষ্ঠির স্মিত হেসে বললেন। ধৃতরাষ্ট্রও সম্মতি জানালেন মাথা নেড়ে।

'যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা সর্বদা শিরোধার্য।' মাথা নত করল বৃহস্পতি। 'তবে আমার একটি আবেদন আছে।'

'কী?'

'আমি আপনাকে একান্তে কিছু বলতে চাই।'

'এগিয়ে এসো।'

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে বৃহস্পতি কয়েক পলক ইতস্ততঃ করল। যুবরাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন তাঁর আবেদনে। এতটা সে আশা করে নি। অবশ্য দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগল না। ধীর পায়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার রাজা আর যুবরাজকে সে প্রণাম জানাল। কয়েক ধাপ উঁচু বেদীতে পাশাপাশি দুটো আসন। দুটিই সিংহ প্রতীকযুক্ত। ধৃতরাষ্ট্রের আসনটি তুলনায় সামান্য উঁচু।

'বলো।'

যুধিষ্ঠির আয়তলোচন দুটি তুলে তাকালেন বৃহস্পতির দিকে। চোখ দুটি অতি শান্ত কিন্তু ততধিক গভীর। বৃহস্পতির মনে হল যুবরাজ যেন তাঁর মনের সব সংবাদ চোখ দুটি দিয়ে পড়ে নিলেন।

'নির্দ্বিধায় বলো।'

চকিতে যাবতীয় সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বৃহস্পতি ফিসফিস করে বলল, 'একজন লোহিতকেশী মানুষ আমার বিবেচনায় খুব রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু গবেষণা আছে। আমি সৈন্ধবী ভাষা জানি।'

অতি অল্প ক্ষণের জন্য যুধিষ্ঠিরে কপালে একটা হালকা ভাঁজ পড়ল। কিন্তু বৃহস্পতির মুখ দেখে মনে হল না যে সে মিথ্যে বলছে।

'সৈন্ধবী ভাষার অস্তিত্ব কি সত্যি?' তিনি জিগ্যেস করলেন।

'সৈন্ধবরা যে সত্যি ছিল তা কি আপনার অজানা যুবরাজ?'

'তা আমার জানা। কিন্তু তাঁরা বহুকাল লুপ্ত। তাঁদের ভাষা কী করে বেঁচে থাকে বৃহস্পতি?'

'তাঁরা পুরোপুরি লুপ্ত নয়। আমার সুদূর পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন সৈন্ধব।'

যুধিষ্ঠির উত্তেজনায় সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বৃহস্পতির কাঁধে হাত রেখে মৃদু স্বরে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে কিছু জিগ্যেস করতে চাই।

তারপর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ পরে বাইরে অপেক্ষমান রথে উঠলেন। তাঁর ইশারায় একজন সারথী বৃহস্পতিকে আরেকটি রথে তুলে নিয়ে অনুসরণ করল যুধিষ্ঠিরকে। একটু পরে রথ দুটি এসে থামল যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত ভবনের সামনে। বৃহস্পতি যুবরাজকে অনুসরণ করে একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে আর কেউ ছিল না।

'সৈন্ধবদের বিষয়ে তুমি যা জান নির্দ্বিধায় খুলে বলো।' যুধিষ্ঠির সামান্য উত্তেজিত গলায় বললেন। 'এটা কি সত্যি যে তাঁরা ফিরে আসবে?'

বৃহস্পতি তখনই কোনও উত্তর দিল না। দাঁড়িয়ে থাকল মাথা নিচু করে।

'উত্তর দাও যুবক! তোমার বক্তব্য গোপন থাকবে।'

'আমি— আমি ঠিক জানি না।' বৃহস্পতি বলতে শুরু করল। 'বহু যুগ আগে যখন সিন্ধু নগর ধ্বংস হয় তখন আমার পূর্বপুরুষ বিদেশে ছিলেন। লোকমুখে

চকিতে যাবতীয় সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বৃহস্পতি ফিসফিস করে বলল, 'একজন লোহিতকেশী মানুষ আমার বিবেচনায় খুব রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু গবেষণা আছে। আমি সৈন্ধবী ভাষা জানি।'

অতি অল্প ক্ষণের জন্য যুধিষ্ঠিরে কপালে একটা হালকা ভাঁজ পড়ল। কিন্তু বৃহস্পতির মুখ দেখে মনে হল না যে সে মিথ্যে বলছে।

নগর ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে আর ফিরে আসেন নি। কোনও এক অসুর রাজ্যে গিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই বিবাহ করে সংসার পাতেন। তিনি সৈন্ধবী ভাষা তাঁর বউকে শিখিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, সে ভাষা যেন বংশের কেউ না কেউ শিখে রাখে। এভাবে বংশ পরম্পরায় আমি সে ভাষা শিখেছিলাম আমার ঠাকুমার কাছে। হস্তিনাপুরে এ ভাষা শুনব বলে কখনও ভাবি নি।'

'সে ভাষা কি লোহিতকেশী ব্যক্তির মুখে শুনেছ?'

'না। যার মুখে শুনেছি তাঁর সঙ্গে লোহিতকেশীর যোগাযোগ আছে। সে আমার বাড়ির পাশেই থাকে। তাঁর নাম অগ্নস। একদিন সে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে একটি শ্লোক উচ্চারণ করছিল। দৈবাৎ আমি সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে শ্লোক সৈন্ধবী ভাষায় রচিত ছিল।'

যুধিষ্ঠির কয়েক পলক বৃহস্পতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'অগ্নস? সে কে?'

১৮

যজ্ঞ উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকজন বয়োজেষ্ঠ মুনি আশ্রমে এসে বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের নিয়ে ভূতমিত্র কিঞ্চিৎ ব্যস্ত। আসার পর তাঁরা পালা করে হাতি চড়ে নগর ঘুরে বেরিয়েছেন। তারপর থেকে আশ্রমে বসে যজ্ঞের আয়োজন দেখছেন আর একটার পর একটা ভুল ধরে আশ্রমিকদের জটিল সমস্যায় ফেলে দিচ্ছেন। যজ্ঞের তিথিক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেলেও আয়োজনের এখনও বাকি। একদিনে করা যায় এমন পাঁচ রকম যজ্ঞই হবে। সব মিলিয়ে সাত দিনের অনুষ্ঠান। শেষ দিন রাজসূয় যজ্ঞ। প্রতিদিন ষোল জন হিসেবে আশি জন ঋত্বিক প্রয়োজন। তাঁদের তালিকা অবশ্য তৈরি, কিন্তু আশি জন ঋত্বিককে কে নেতৃত্ব দেবে— সেটা এখনও স্থির করতে পারেন নি ভূতমিত্র। আগত বয়োজেষ্ঠদের মধ্য থেকেই একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর। সেই একজনকে কৌশলে বেছে নিতে হবে। তাঁর আগে মুনিদের মন বোঝা দরকার। তাঁদের মধ্যে কার বয়স সব চাইতে বেশি তা বোঝা দুষ্কর। মুনিরা নানা রকম যোগকৌশল অবলম্বন করেন। বিভিন্ন ওষধি বৃক্ষলতা সম্পর্কে জানেন। তাঁদের বয়স বোঝা সহজ কর্ম নয়।

বয়োজেষ্টদের একজন যবক্ষীর মুনি। তিনি যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য হব্যদ্রব্য রান্নার বিষয়ে খোঁজ খবর করছিলেন। ভূতমিত্রকে দেখে বিরক্তির সঙ্গে একটা মাটির ছোট কলস মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'এইসব আজ্য কোত্থেকে এনেছ শুনি? গন্ধই নেই!'

অভিযোগটা ঠিক নয়। কলসী থেকে ঘি-এর সুঘ্রাণ ফুরফুর করে বের হচ্ছিল। ভূতমিত্র সবিনয়ে বললেন, 'মহাশয়ের নাক বোধকরি শ্লেষ্মাচ্ছন্ন। আজ্য থেকে বেশ গন্ধ বেরুচ্ছে!'

'এ দিয়ে যদি পরিবাপ আর চরু প্রস্তুত হয় তবে ইন্দ্র প্রসন্ন হবেন বলে মনে হয় না।'

'আজ্ঞে এই ঘৃত নগরে অতি মানী লোকেরা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের নির্বাচনে ভরসা রাখা যায়।'

'ভাল হলেই ভাল।' যবক্ষীর কলসীর মধ্যে তর্জনি ডুবিয়ে একটু ঘি তুলে জিভে লাগিয়ে চুষলেন। মনে হল তাঁর মন্দ লাগল না স্বাদটা।

'ঋত্বিকদের নেতা কাকে করা যায়?'

'কার কথা ভেবেছ?'

প্রতিপ্রশ্নে ভূতমিত্র একটু সতর্ক গলায় উত্তর দিলেন, 'পুষ্যমিত্র কি এই দায়িত্ব সামলাতে পারবেন?'

'পুষ্যমিত্র?' খুব অবাক হলেন যবক্ষীর। 'যখন সমবেত সামগান হবে তখন স্বর প্রয়োগে ভুল হচ্ছে কি না, কেউ বিবাদী স্বর লাগাচ্ছে কি না, বীণতন্ত্রীর সুরে সবার সুর মিলছে কি না— এসব উনি বুঝবেন ভেবেছ?'

'বুঝবেন না?'

'এটা অনস্বীকার্য যে তাঁর বৈদিকজ্ঞান প্রখর। কিন্তু সুরজ্ঞান বলে কিছু নেই।'

'ভর্তৃহরি মুনি কেমন হবে?'

'আহা! তাঁর সুরজ্ঞান তো গন্ধর্বের মত। বীণাধ্বনিও লজ্জা পাবে। কিন্তু উচ্চারণ? মূর্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ শুনলে মনে হয় তালব্য বর্ণ শুনছি। —ভাল কথা, পুরোডাশ কে বানাবে? শেষবার সুস্বাদু পুরোডাশ খেয়েছিলাম আমার এক শিষ্যগৃহে। আহা! কী স্বাদ! জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না।'

ভূতমিত্র একটু হতাশ স্বরে বললেন, 'সে লোককে আমি পাঠিয়ে দেব। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ধৌম্যকেই ডেকে আনতে হবে।'

ধৌম্য হলেন রাজপুরোহিত। ভূতমিত্রকে তিনি স্নেহ করেন। যবক্ষীর তাঁর নাম শুনে ভুরু কুঁচকে

বললেন, 'ধৌম্যকে ডাকবে? তিনি ঋত্বিকদের নেতা হবেন বলছ?'

'ওনার তো অত সময় নেই। তবে নেতা নির্বাচনে সাহায্য করতে পারবেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে দেবেন। কার উচ্চারণ খারাপ, কার সুরজ্ঞান নিখুঁত— এসব বিচারের যোগ্য ব্যক্তি তিনি।'

'ঠিক বলেছ।' এবার খুশি দেখাল যবক্ষীর মুনিকে। 'আমার ধারণা উনি সব কিছু নির্ভুল এবং নিখুঁত পাবেন আমার মধ্যে।'

'একদম।'

ভূতমিত্র প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। একটু পরে দেখা গেল তিনি সোমজ্ঞ মুনির সঙ্গে আলোচনা করছেন। সোমজ্ঞ মুনি বেশ উত্তেজিত স্বরে বলছেন, 'যবক্ষীরকে বলে দিও যে রাজপুরোহিত ধৌম্য অত বোকা নন। তিনি ভালমত জানেন যে যেখানে সোমজ্ঞ মুনি আছেন, সেখানে আর কাউকে নেতা রূপে ভাবাই অন্যায়। যজ্ঞবেদীর মাপ ঠিক আছে কি না তা বোঝা যবক্ষীরের সাধ্য নয়। গণিতে সে বরাবর কাঁচা। উচ্চারণ তাঁর মোটামুটি হলেও গাইবার সময় বীণার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারে না। তাঁকে বরং সোমলতা পিষ্ট করার দায়িত্ব দিলে ভাল হবে!'

এরপর আরও দু-জনের সঙ্গে আলোচনা করে ভূতমিত্র হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় বসে ভাবতে লাগলেন কী করা কর্তব্য। সাতদিন ধরে উৎসব চলবে বলে আশ্রমের বাইরে বড় মাঠে পসারীর দল এসে শিবির বসাতে শুরু করেছে। ভানুমতী-ভোজবাজির দলও উপস্থিত। নৃত্যগীতাদির জন্য অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করছে প্রকৌশলী আর শ্রমিকেরা। সব মিলিয়ে জোর একটা মেলা বসতে চলেছে আশ্রমের বাইরে। চারদিকে বেশ কলরব, কোলাহল। আশ্রমের ভেতরেও একটি ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চল জুড়ে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন কুটির। যজ্ঞ দেখতে নগরের বহু মানয়গণ্য ব্যক্তি আসবেন। কুটির নির্মিত হচ্চিল তাঁদের বিশ্রামের জন্য।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ভূতমিত্র তাজা হলেন। এক শিষ্যকে ডেকে বললেন, 'ভুসুকু কোথায় রে?'

'খুঁজে আনব?'

'হাতি নিয়ে আসতে বল। স্বর্ণভস্ম সংগ্রহ হয় নি। তা ছাড়া দু-একটি নেমন্তন্ন করাও বাকি আছে।'

এক দণ্ড কাটলে দেখা গেল ভূতমিত্র হাতি চেপে আশ্রম থেকে বের হচ্ছেন। হাতি হেলতে দুলতে জনাকীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল ছয় সংখ্যক রাজপথের দিকে। সেদিকেই রসায়ণবিদ ধাতুরত্নের বাড়ি। নগরীর সেরা ধাতুভস্মকার তিনি। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র যখন যজ্ঞের আয়োজন করেন তখন সে বাড়ি থেকেই স্বর্ণভস্ম যায় ।

ছয় সংখ্যক রাজপথে ভিড় তেমন নেই। ভুসুকু এদিকটায় তেমন আসে নি। সে লক্ষ্য করল এদিককার বাড়িঘর সাধারণ। অধিকাংশ বাড়ির সামনের উদ্যান ছোট ছোট। কোনও কোনও বাড়ি খাড়া উঠেছে পথের ঠিক পাশ থেকে। অট্টালিকা এবং প্রাসাদের সংখ্যা খুব কম। ভূতমিত্র বললেন, 'এদিকে একজন লোকই বিখ্যাত। ধাতুরত্ন। ওই হল তাঁর বাড়ি।

মাঝারি মাপের একটি উদ্যান শোভিত বাড়ির সামনে ভুসুকু হাতি থামাল।

'ধাতুরত্নের স্বর্ণভস্ম কাশিতেও যায় বুঝলে?' হাঁটু মুড়ে বসা হাতির পিঠ থেকে নেমে বললেন ভূতমিত্র। 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমার অন্ততঃ দেড় দণ্ড সময় লাগবে।'

ভূতমিত্র পা বাড়ালেন। ভুসুকু এদিক ওদিক তাকাল। দেড় দণ্ড কাল অপেক্ষা করতে হবে। আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করলে মন্দ হবে না। হস্তিনাপুর বিরাট নগর। ভুসুকু এখনও এই মহানগরের তেমন কিছু দেখে উঠতে পারে নি। হাতিটাকে উদ্যানের একপাশে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করল দু-জন লোক একটা ঠেলাগাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘাসের বড় বড় ঘাসের আঁটি নিয়ে আসছে। ভুসুকু খুশি হল। ধাতুরত্ন চারপেয়ে অতিথির আপ্যায়নের দিকটাও ভেবেছেন।

'মহাশয় শুনেছি কামরূপের লোক?'

ওদের একজন ঘাসগুলো নামাতে নামাতে জিগ্যেস করল ভুসুকুকে। ভুসুকু হাসল। 'কামরূপ তো অনেক বড় রাজ্য। আমার দেশ হল দিস্তং নদীর ধারে। তা সে দেশ অবশ্য কামরূপের অধীনেই।'

'হস্তিবিদ্যা শিখে হস্তিনাপুরে এসে ভালই করেছেন। অচিরেই আপনার শত দাসদাসী আর চমৎকার প্রাসাদ হবে। অচ্ছা, আপনার কি মন্ত্র জানেন?'

'মন্ত্র?' ভুসুকু অবাক হল। 'বেদমন্ত্রের কথা বলছেন?'

'না না। সে মন্ত্র নয়।' আঁটিগুলো নামানর কাজ শেষ। লোকটা এবার ভুসুকুর কাছে এসে দাঁড়াল। 'এত বড় জীবটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন— কোনও মন্ত্র লাগে না বলছেন?'

দ্বিতীয় লোকটি এবার বলল, 'ঘাসগুলো খাচ্ছে না তো! গরু হলে এতক্ষণে হামলে পড়ত!'

ভুসুকু জানে যে সে না নির্দেশ দেওয়া অবধি হাতি ঘাসগুলোয় শুঁড় ছোঁয়াবে না। তাই মুখ দিয়ে একটি বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণ করল সে। হাতিটা দু-বার লেজ দুলিয়ে শুঁড় বাগিয়ে তুল নিল একটা আঁটি।

'সত্যি! বাড়ি ফিরে বাচ্চাদের বলার মত ব্যাপার একটা!'

লোক দুটো গাড়ি নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাতি বিষয়ক কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। ভুসুকু নিশ্চিন্ত হয়ে উদ্যান থেকে বেরিয়ে পথে এসে চারদিক একবার দেখে নিল ভাল করে। পথ চলতি মানুষের কাছে হাতিটি দ্রষ্টব্য হতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল ধাতুরত্নের বাড়ির সামনে। পথে রথ-ঘোড়া নেই বললেই চলে। ভারবাহী মোষের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটু হাঁটতেই একটা মিষ্টির দোকান দেখল ভুসুকু। সুদৃশ্য রেকাবিতে পুরোডাশ সাজিয়ে রাখা। ভুসুকুর খেতে ইচ্ছে হল। বণিক সর্বাঙ্গ গরম কাপড়ে জড়িয়ে ঢুলছিলেন। ভুসুকু দাঁড়াতেই তিনি চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'বলুন ভাই কী চাই?'

'পুরোডাশ কেমন হবে?'

'আমার দোকানের পুরোডাশের কথা বলছেন?' বণিকের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 'হস্তিনাপুরে এমন পুরোডাশ আপনি খুব কম পাবেন ভাই! বিশ্বাস না হলে একখানা মুখে ফেলে দিন।'

বণিকের বাচনভঙ্গীতে ভুসুকু মজা পেল। বলল, 'দিন একগণ্ডা। খিদে খিদে পাচ্ছে!'

'যবের দেব না চালের দেব? তবে পুরোডাশের স্বাদ পেতে হলে চালেরটাই উপযুক্ত। মূল্য যদিও একটু বেশি। কিন্তু মুখে দিলে বুঝবেন সে মূল্যও যথেষ্ট নয়।'

'চালেরটাই দিন।'

'নালন্দার নাম শুনেছেন? পুরোডাশের চাল আমি সেখান থেকে আনাই। স্বাদেগন্ধে অতুলনীয়।'

পাতায় মোড়া পুরোডাশগুলি নিয়ে দাম মিটিয়ে ভুসুকু ভাবল অদূরে যে বিরাট গাছটা রয়েছে, তার তলায় গিয়ে বসবে। গাছতলাটা বাঁধান। আরাম করে বসে খাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিক কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর ভুসুকু একটু চমকে উঠে থমকে গেল একটা দৃশ্য দেখে। কিছুটা দূরে রাস্তার ওপাড়ে একজন লালচুলের মানুষ একটি কম বয়সী ছেলের সঙ্গে আলাপ করছে। পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মাকে চিনতে ভুসুকুর কোনও অসুবিধে হল না। তাঁর সঙ্গে থাকা ছেলেটিকেও সে চেনে। তাঁর নাম অদত্ত। সে ভূতমিত্রের আশ্রমে পড়ে।

ভুসুকু না বসে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে দেখতে লাগল ওদের।

১৯

সন্ধের ঠিক মুখে বিদেশি পাড়ায় যে বাড়িতে অন্নরাজ অঙ্গার গোপনে বসবাস করছেন, তার প্রবেশদ্বারে কাছে তিনটি শক্তিশালী অশ্ব এসে দাঁড়াল। অশ্বারোহীরা প্রত্যেকেই নিজেদের এমন ভাবে উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন যে কাউকেই চেনা যাচ্ছিল না। প্রবেশদ্বার বন্ধ ছিল। অশ্বারোহীরা দাঁড়ান মাত্র তা খুলে গেল। তিনজন ভেতরে প্রবেশ করলেন। দ্বার আবার রুদ্ধ হল আগের মত। অশ্বারোহী তিনজন ভেতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে নিজেদের ঘোড়া থেকে নামালেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁদের অভিবাদন জানালেন নত হয়ে।

তিনজনের মধ্যে একজন তাঁর উত্তরীয় মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিতে দেখা গেল সে পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মা। তিনি বাকি দু-জনের উদ্দেশে বললেন, 'আমাকে অনুসরণ করুন। গুরুদেব নিজের গৃহেই রয়েছেন। তবে ঠিক এই ক্ষণে তিনি দেখা করবেন না। আমাদের এক দণ্ড অপেক্ষা করতে হবে।'

বাকি দু-জন কোনও কথা না বলে পুন্ডরীকাক্ষকে অনুসরণ করল। বাড়িটি দ্বিতল। ওপরের তলায় একটি সুসজ্জিত এবং বহুমূল্য আসবাবপত্রে ভরা বৃহৎ কক্ষে তাঁরা প্রবেশ করলেন। পুন্ডরীকাক্ষ কক্ষের দ্বার বন্ধ করে লঘু স্বরে বললেন, 'এবার তোমরা নিশ্চিন্ত। এই কক্ষে বিনানুমতিতে কেউ আসবে না।'

বাকি দু-জন মাথার ওপর থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। দেখা গেল তাঁদের দু-জনের একজন কর্ণ এবং অপরজন দুর্যোধন।

'তুমি বলছ স্বয়ং অন্নরাজ এই বাড়িতে বসবাস করেন?' দুর্যোধন বসলেন। 'এই স্থান কি তাঁর পক্ষে নিরাপদ?'

'যতক্ষণ গোপন থাকে ততক্ষণ বিপদের কিছু নেই।' পুন্ডরীকাক্ষ উত্তর দিলেন। 'আপনি কি কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

দুর্যোধন কিছু বললেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন পুন্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে।

'আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন যুবরাজ?' পুন্ডরীকাক্ষ ঠিক বুঝতে পারল না কেন দুর্যোধন ওভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। দুর্যোধন এবার চোখ

সরালেন। কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে বলে দাও আমি কী ভাবছি।'

কর্ণ শান্ত গলায় বললেন, 'আমরা যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনিই যে অম্লরাজ অঙ্গার— তার প্রমাণ কী?'

'এই কথা?' পুন্ডরীকাক্ষের গলায় স্বর হালকা শোনাল। 'আপনার সঙ্গে প্রতারণা করার অর্থ আমি জানি যুবরাজ। প্রাণের মায়া আমারও আছে।'

দুর্যোধন খুশি হলেন। খুশিটা তাঁর হাসিতে প্রকাশ পেল। 'যদি তাঁর পরিকল্পনা সফল হয় তবে তাঁকে আমি যা দেব তা স্বয়ং ইন্দ্রদেবও দু-বার ভাববেন। তুমিও নেহাৎ কম পাবে না পুন্ডরীকাক্ষ। কিন্তু সবার আগে চাই প্রজাদের সমর্থন। জনপ্রিয়তার বিচারে পাণ্ডবদের তুলনায় আমি বা দুঃশাসন অনেক পিছিয়ে। কর্ণকে তো অনেকে রাজা বলে স্বীকারই করতে চায় না। মানছি সে সুতপুত্র। কিন্তু বীরত্বের বিচারে অর্জুনের তুলনায় আমি তাঁকে এগিয়ে রাখি।'

'গদাবিদ্যায় ভীমকেও আমি তোমার তুলনায় বালক ভাবি সখা!' কর্ণ মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন। দুর্যোধন চোখেমুখে একরাশ ঘৃণা ফুটিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'ওকে আমি সুযোগ পেলে পিঁপড়ের মত টিপে মারব কর্ণ! ও কেবল অসুরদের মত খেতে পারে।'

'অসুরদের খামোকা আমরা মাথায় তুলে কেন রাখছি তা বলতে পারো?'

কর্ণের প্রশ্নে দুর্যোধন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ক্রুরতা ফুটে উঠল।

'তুমি হাসছ যে?'

'তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিদ্যা ও জ্ঞান বিনিময়ের পালা চলছে কর্ণ। ধাতুবিদ্যায়, বিশেষ করে লৌহবিদ্যায় এখনও আমরা স্বাবলম্বী নই। উৎকৃষ্ট মরিচাবিহীন লৌহ নির্মাণ কৌশল আমরা এখনও ভাল মত আয়ত্ত্ব করতে পারি নি। তাই বিকল্প না পাওয়া অবধি অসুরদের এ দেশ থেকে তাড়ান যাবে না।'

কর্ণ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন ঘণ্টার শব্দে। পরপর তিনবার ঘণ্টা বাজল কোথাও। পুন্ডরীকাক্ষ এতক্ষণ দুর্যোধন ও কর্ণের কথপোকথন মন দিয়ে শুনছিলেন। ঘণ্টার শব্দে তাঁর চোখেমুখে পরিবর্তন এল। উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'ঘণ্টার শব্দের মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিলেন যে আমরা এবার সাক্ষাৎ করতে যেতে পারি।'

'ঘর থেকে বের হতে হবে?' কর্ণ তাড়াতাড়ি উত্তরীয় তুলে মাথা ঢাকতে গেলেন।

'প্রয়োজন নেই। কেবল লক্ষ করুন।'

পুন্ডরীকাক্ষ ঘরের পেছনে একটি গোলাকার স্তম্ভ দু-হাতে ধরে একটু মোচড় দিলেন। সেটা খানিকটা ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঘড় ঘড় শব্দ। বাকি দু-জনকে বিস্মিত করে সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের পেছনের দেয়ালের একটা অংশ সরে গিয়ে চৌকো আকারের একটি ফাঁক তৈরি হল। একজন মানুষ অনায়াসে সেই ফাঁক গলে অপর দিকে চলে যেতে পারে।

'আসুন এ পথে।' ওদের আহ্বান জানালেন পুন্ডরীকাক্ষ। 'এ বাড়িতে আসার আগে গুরুদেব তাঁর মায়াবিদ্যার দ্বারা অনেক রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তার একটি দৃষ্টান্ত আপনারা দেখছেন এখানে।'

'অবিশ্বাস্য!' ফাঁক দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন কর্ণ।

ওধারে একটি বৃহৎ কক্ষ। কক্ষটি প্রায় অন্ধকার। একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। তার অতি অল্প আলোয় দুর্যোধনের চোখে পড়ল একটি বড় আসন। সে আসনে কেউ বসে আছেন।

ঘড় ঘড় শব্দে দেয়ালের ফাঁক বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই কক্ষের শেষপ্রান্তের দুটি কোণে জ্বলে উঠল দুটি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা। ফড়ফড় শব্দে ঘরময় লাল আলো ছড়িয়ে জ্বলতে লাগল শিখা দুটি। চারদিক ভরে গেল হালকা ধোঁয়ায়। ধোঁয়া আর লাল আলোর মধ্যে আসনটি ঘুরতে লাগল বৃত্তাকারে।

'উপবেশন কর যুবরাজ দুর্যোধন!' ঘুরন্ত আসন বসা মানুষটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার। শান্ত কিন্তু গমগমে সেই স্বর। সহসা লাল আলো নিভে গেল। প্রদীপটিও। কয়েক পলক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল কক্ষটি। তারপর দপদপ করে দুটি প্রদীপ শিখা জ্বলে উঠল আসনের দু-পাশে। দুর্যোধন দেখলেন দুটি উঁচু পিলসুজে দু-খানি প্রদীপ উজ্জ্বল শিখায়

পুন্ডরীকাক্ষ ঘরের পেছনে একটি গোলাকার স্তম্ভ দু-হাতে ধরে একটু মোচড় দিলেন। সেটা খানিকটা ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঘড় ঘড় শব্দ। বাকি দু-জনকে বিস্মিত করে সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের পেছনের দেয়ালের একটা অংশ সরে গিয়ে চৌকো আকারের একটি ফাঁক তৈরি হল। একজন মানুষ অনায়াসে সেই ফাঁক গলে অপর দিকে চলে যেতে পারে।

জ্বলছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটি ছোট আসন তাঁদের সামনে কী ভাবে জানি চলে এসেছে।

'বসো।' বিপরীত দিকের আসনের ঘূর্ণন থেমে গেল। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আসনে উপবিষ্ট মানুষটির মুখ। অম্লরাজ অঙ্গার।

'প্রণাম।' দুর্যোধন মাথা নত করলেন। 'আমি অভিভূত। এ কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব প্রিয় মহামায়াবী!'

'তোমার সঙ্গে কি অঙ্গরাজ কর্ণ?'

'হ্যাঁ।'

'মহাবীর কর্ণকে আমার কুটিরে স্বাগতম!'

কর্ণ এতটা আশা করেন নি। তিনি অতিশয় প্রসন্ন হলেন। আসন গ্রহণ করে দুর্যোধন বললেন, 'আপনার হস্তিনাপুরে অবস্থান কতটা গোপনীয়?'

'পুন্ডরীকাক্ষ একটি ভুল করেছে। সে ভুসুকু নামক একটি ছেলেকে অপহরণ করেছিল আমার নির্দেশে, কিন্তু ছেলেটি পালিয়ে যেতে সফল হয়। তাঁকে পুনরায় অপহরণ না করা অবধি আমি পুরোপুরি চিন্তামুক্ত নই।'

'তাঁকে পুনরায় অপহরণে সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যা আছে। তাঁকে দু-জন রক্ষী চোখে চোখে রাখছে। এই নিরাপত্তা সে কী ভাবে পাচ্ছে তা আমার অজানা। অনুমান করি কোনও রাজপুরুষ তাঁর নিরাপত্তার জন্য রক্ষী নিয়োগ করেছে।'

'রাজপুরুষ?' দুর্যোধন বিস্মিত হলেন। 'আপনি নিশ্চিত?'

'রাজপুরুষ ব্যতীত এ ধরনের গুপ্তরক্ষী নিয়োগ করা অসম্ভব দুর্যোধন। রক্ষী থাকতে তাঁকে গোপনে অপহরণ কার্যত অসম্ভব।'

'ছেলেটিকে অপহরণের যৌক্তিকতা কী?' কর্ণ এবার জানতে চাইলেন। বিষয়টি তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না। এ ব্যাপারে পুন্ডরীকাক্ষ তেমন কিছু জানায় নি তাঁকে। দুর্যোধনও না।

'শোন বৎস্য কর্ণ!' অম্লরাজ অঙ্গার ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনের বস্ত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উত্তরীয়ও তাই। দুর্যোধনেরাও উঠে দাঁড়াল শ্রদ্ধাবশতঃ। এর মধ্যেই অম্লরাজ যেন মনহরণ করে ফেলেছে তাঁদের দু-জনের।

'তুমি সুতপুত্র—' ওদের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন অম্লরাজ। 'দুর্যোধন ক্ষত্রিয়পুত্র। বীরত্বের মাপকাঠিতে তোমাদের দু-জনের তুল্য যদি কেউ থাকে তবে তাঁরা হলেন অর্জুন আর ভীম। কিন্তু তোমাদের মূল সমস্যা হল তোমাদের কোনও যুধিষ্ঠির নেই।'

'যুধিষ্ঠির আরও বড় বীর?' কর্ণ অসহিষ্ণু গলায় উচ্চারণ করল বাক্যটা। 'আপনি কি তাঁকে—।'

'মুর্খ!' চাপা স্বরে শব্দটা ছিটকে বের হল অম্লরাজের গলা থেকে। শরের মত সে শব্দ বিদ্ধ হল কর্ণের মনে। তিনি থতমত খেয়ে চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন।

'জ্ঞানবুদ্ধিকে মর্যাদা দিতে শেখো বৎস্য কর্ণ।' এবার অম্লরাজের স্বর মাখনের মত। তিনি যেন কর্ণকে একজন বালক বিবেচনা করে কথা বলছেন। 'বিদ্বেষ নিজেই একটি অস্ত্র। কেবল ক্ষাত্রধর্মের সাহায্যে তা প্রয়োগ করা যায় না। বিদ্বেষ প্রয়োগের জন্য চাই পরিকল্পনা। এমন এক পরিকল্পনা যা যুধিষ্ঠিরকেও বিভ্রান্ত করতে পারে।'

'বড়দার বুদ্ধি নিয়ে অবশ্য আমি কোনও মন্তব্য করব না। বড়দা কোনওদিন মিথ্যে কথা বলে নি।' দুর্যোধন স্বীকার করল এবার। 'আমি বুঝতে পারছি মহামায়াবী। বিদ্বেষের পরিণতি হল গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধ হলে আমরাই জিতব। কিন্তু যুদ্ধ না হলে আমরা জিতব না। যুদ্ধ আটকাতে পারে কেবল বড়দা।'

'অসাধারণ দুর্যোধন!' আনন্দে করতালি দিলেন অম্লরাজ। তাঁর চোখ দুটো জ্বলছিল। 'প্রজাদের মধ্যে আগে বিভাজন ঘটাতে হবে। প্রথমে হস্তিনাপুরকে আমরা মনের দিক দিয়ে দু-ভাগ করে দেব। আর এই কাজ শুরু করার সব চাইতে উপযুক্ত স্থান হল ভূতমিত্রের আশ্রম। কারণ সেখানে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ছেলেরা পাঠ নেয়। এই ছেলেরাই আগামি দিনে হস্তিনাপুরের অমাত্য, মিত্র এবং মন্ত্রী হবে। নগরীতে এদের আলাদা মর্যাদা রয়েছে। এদের কথা মানুষ শুনবে। গুরুত্ব দেবে।'

অম্লরাজ থামলেন। তিনি জানেন ওদের দু-জনের কাছে কেবল একটা বিষয় স্পষ্ট হয় নি। এবার সেটা স্পষ্ট করার জন্য কেটে কেটে বললেন, 'ভুসুকু নামক ছেলেটি ওই আশ্রমের মাহুত। কাজটি আমি তাঁর মাধ্যমেই শুরু করতে চেয়েছিলাম। আমি তাঁকে সম্মোহিত করতে চাই। কিন্তু একজন রাজপুরুষ তা হতে দিচ্ছেন না। তোমরা কি অনুমান করতে পারো তিনি কে?'

'বড়দা!' বিড়বিড় করে বললেন দুর্যোধন।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক থ্রিলার। পর্ব ৫

মরা মৌমাছির চোখ

সাগরিকা রায়

জবানবন্দী চলছে। যোগিন, পদ্ম, ব্রজেন কী বলতে চায়? কৃপাসিন্ধু ভটচার্য নীলমের চোখের তারায় কিসের সঙ্কেত দেখে? কুয়াশার ভেতরে কার ছায়া! বাড়ির ছোটছেলের মৃত্যু কি অস্বাভাবিক মৃত্যু ?

২২

বড়মণিকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নীলম সেখানেই ছিল। কিন্তু পুলিশের কড়াকড়িতে ওকে বাড়িতে ফিরতে হল। নাকি জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

বাড়িতে ফিরে অনেকটা জল খেল নীলম। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে যেন। খুব টায়ার্ড লাগছে। যা যাচ্ছে! ইচ্ছে করছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু উপায় নেই। ওরা নীচে ওয়েট করছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কী জিজ্ঞাস্য রয়েছে ওঁদের?

বেসিনের সামনের আয়নায় নিজেকে দেখল নীলম। হয়তো নিজেকে নয়। অন্য কাউকে দেখছিল যার ছায়া আয়নায় পড়ছে না। ভয়চকিত চোখে পদ্ম দাঁড়িয়েছিল। নীলম চোখে মুখে জল দিয়ে পদ্মর দিকে তাকাল। পদ্ম নীলমকে কিছু বলবে বলবে করছিল। নীলম সেটা বুঝে তাকাল।

"কী হবে দিদি?"

"কিসের কী হবে? যা, গিয়ে বস। যা জানতে চাইবে, যা জানিস, সব বলবি। কিছু ভয় নেই।"

পদ্মকে জোর গলায় বোঝালেও নিজের বুকের ভেতরে মাদল বাজছিল। দূরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্রজেন, যোগিন, পদ্ম। দেবব্রত আর সুবর্ণা এল। ম্যানেজারবাবু আছেন। বাবুইও? ওকে কেন এখানে আনা হয়েছে? কঙ্কাকে বা কেন?

"যোগিন, বাদলাকে ডেকে আন। ওকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ওরা।" দেবব্রত চেয়ারে বসল।

যোগিন উঠতেই একজন কনস্টেবল সঙ্গে চলল। কেন এভাবে পাহারা দিচ্ছে? নীলম একটু অবাক হল। পালিয়ে যাবে যোগিন? ধুস। শেষে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

নীলম দরজার পাশের একটা চেয়ারে বসল। ভারি পর্দার ওপাশে কথাবার্তা কিছু শোনা যাচ্ছে। অল্প অল্প। ছিটকে আসা কিছু শব্দ। ওখানে কজন আছে? ধমক দিয়ে কথা বলবে কি? কড়া গলায় কথা? বড়দাবাবুকে ডাকল প্রথমেই। কী জিজ্ঞাসা করবে? কিছু নিশ্চয় শোনা যাবে? নীলম খেয়াল করতে থাকে। দেবব্রত খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ঢুকছে। ঢোকার আগের মুহূর্তে সুবর্ণা হালকা গলায় অস্পষ্ট শব্দ করল। যেন —এই! এইরকম শব্দ। ওকে ডাকল সুবর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকাল দেবব্রত। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কথা হল। দেবব্রত মুখ ঘুরিয়ে পর্দা সরালো। সুবর্ণা মুখ নামিয়ে বসে রইল চুপচাপ। আজ একটু অগোছালো দেখাচ্ছে ওকে। সাজেগোজে যত্ন নেই!

"বসুন।"

বসল দেবব্রত। টেবিলের ওপাশে পুলিশ অফিসার, অন্য দুজনের একজন সেকেন্ড অফিসার, অন্যজনের সামনে জাবেদা খাতা খোলা। জবানবন্দী নেবেন।

নাম, ধাম ইত্যাদি পর্ব শেষ হলে মূল প্রশ্নের দিকে গেলেন অফিসার, "আপনার বাবার মৃত্যুটা কিভাবে হল?"

"উনি ঠিক আমার ভাইয়ের মত ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।"

"কিন্তু আপনার ভাই তো আত্মহত্যা করেননি। আপনি জানেন, তাঁকে মার্ডার করা হয়েছে! পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে!"

"না, মানে আমি বলতে চেয়েছি, ছাদ থেকে পড়েই ওর মৃত্যু হয়েছিল। বাবার মতই।"

"আপনার বাবার মৃত্যু কি দুর্ঘটনা বলে মনে করেন আপনি? নাকি... সেটা মার্ডার নয় বলছেন?"

"পুলিশ দুর্ঘটনা বলেছিল।"

"অর্থাৎ মার্ডার হওয়াও বিচিত্র নয়! তাইতো? হতেও পারে? আপনি সিওর নন। কেন?"

"মানে, ভাইয়ের ব্যাপারটা দেখে মনটা ইদানিং কু ডাকছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা কি সত্যি সুইসাইড করেছিলেন! সেখানে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সুইসাইড বলা হয়েছে যদিও।" দেবব্রত রুমাল বের করে মুখ মোছে।

"আচ্ছা, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ভাল। যেমন হওয়া উচিত তেমনই।"

"আপনার ভাই নিয়মিত বাড়িতে আসতেন না। কোথায় থাকতেন সে সময়ে?"

"জানি না।"

"বাড়িতে এসে ছাদে বেড়াতে ভালবাসতেন।"

"সেটা আমি কখনই দেখিনি। ইনফ্যাক্ট ও ছাদে যায়, সেটা আমি সেদিন জেনেছি, যেদিন ওর বডি পাওয়া গেল। যা থেকে বোঝা গেল, ও ছাদ থেকে পড়েছে।"

"আপনি ছাদে যান?"

"একেবারেই হয় না। কখন যাব? তাছাড়া ওসব খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ আমার নেই। সারাক্ষণ ব্যবসাপত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকি।"

"আপনার বাবা বেঁচে থাকতে আপনার ভাইয়ের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য কি একইরকম ছিল?"

"না। ও বাবাকে খুব ভালবাসতো। সারাজীবনই ও খানিকটা জেদি, গোঁয়ার! বাবা বেঁচে থাকতে ও অনেকটা ঠান্ডা ছিল। বাবা চলে যাওয়ার পর ওর স্বভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছিল। ক্ষোভ, রাগ... !"

"কিসের জন্য ক্ষোভ?"

"সেটা জানি না। বুঝতে পারতাম একটা ক্ষোভ রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু সেটা কেন, তা বলেনি আমাকে।"

"জানতে চেয়েছিলেন?"

"না। ওর সঙ্গে কথা বলে অপমানিত হতে মন চায়নি। তবে, আমি যেটা বুঝেছিলাম, সেটা খুব ভাল কিছু নয়। ওর ধারণা হয়েছিল, বাবাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল।"

"অর্থাৎ, শুভব্রত বিশ্বাস করতেন, তাঁর বাবার মৃত্যুটা নেহাৎ দুর্ঘটনা নয়। তাকে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কে করেছিল বলে মনে হয়?"

"শুভ বাড়ির মেম্বরদের কাউকেই সন্দেহ থেকে বাইরে রাখেনি। এমন কি আমাকেও... !"

"আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি সবচেয়ে লাভবান হবেন। সুতরাং শুভব্রত খুব ভুল কিছু বলেননি মনে হয়!"

"তাই বলে, আমার বাবাকে আমিই... ?" বিস্ময়ে কথা বের হল না দেবব্রতের মুখ থেকে।

কৃপাসিন্ধু হাসল, "ঘটনার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"কোন ঘটনা?"

"শুভব্রতর মৃত্যুর দিন।"

"ঘুমিয়ে ছিলাম ন্যাচারেলি।"

"মৃত্যুর সময় রাত সাড়ে আটটা। তখন ঘুমিয়ে ছিলেন না।"

"সম্ভবত বাড়িতে হিসেবপত্র দেখছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে না। রোজের নিয়ম অনুযায়ী হিসেবপত্রই দেখছিলাম।"

"কোনও আওয়াজ পাননি?"

"না। পেলেও খেয়াল করিনি সেভাবে। বাড়িতে অনেক লোক। আওয়াজ হচ্ছেই নানারকম। বুঝতে পারিনি এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে।"

"হিসেবপত্র করার সময়ে ম্যানেজারকে দরকার হত না?"

"পাঁচজনকে জানিয়ে নিজের কাজ করাটা আমার স্বভাবের বাইরে।"

"ঠিক আছে। আসুন আপনি।"

দেবব্রত নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। ভ্রু কুঁচকে আছে ওর। আবোলতাবোল প্রশ্ন করে ওর মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে এরা।

ভেতরে তখন সুবর্ণাকে প্রশ্ন করা শুরু হয়েছে। সবাই ব্যস্ত রয়েছে। উত্তেজনায় আচ্ছন্ন। কেউ দেখতে পেল না বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে কেউ একজন। দ্রুত জবালার ঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। তাকে কেউ লক্ষ্য করছিল। সে জানে না কে তাকে ফলো করছে! বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে দ্রুত তার পেছনে নিঃশব্দে রওনা হয়েছে যোগিন। ঘরের ভেতরে তখন সুবর্ণা বর্ণনা করছে শুভব্রত ঠিক কতটা অসামাজিক হয়ে উঠেছিল। পরিবারের সকলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওর। কারওর সঙ্গেই অ্যাডজাস্ট করতে পারতো না।

"দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"খুব যে গাঢ় সম্পর্ক ছিল, তা বলতে পারব না। তবে দেবব্রত ভাইকে ভালবাসতো। চেয়েছিল ব্যবসার কাজে শুভ হেল্প করুক। কিন্তু শুভ চায়নি। ও এড়িয়ে চলত। শুধু দেবব্রতকেই নয়, ও পরিবারের কাউকেই পছন্দ করতো না বলে মনে হয় আমার!" সুবর্ণা একটু বেশি কথা বলছিল। স্বভাবের বাইরে এসে কথা বলছিল। হয়তো বলতে ভাল লাগছিল। এ বাড়িতে কথা বলার সুযোগ নেই। কঙ্কার সঙ্গে আর কত কথা বলা যায়! দেবব্রতকেও কী বা বলবে! যা দেখে, যা শোনে, তা থেকে যেটুকু ধারণা হয়, সেটুকু বলতে ভাল লাগছিল হয়তো।

"আপনার শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার ধারণা ঠিক কী? এটা কি আত্মহত্যা? নাকি... কী মনে হয়? নিজস্ব ধারণা তো আছে একটা।"

"উম, দেখুন, আমি মনে করি ওটা দুর্ঘটনা। উনি দারুণ মিশুকে ছিলেন। হাসিঠাট্টা করতেন। যেমন স্বভাব ছিল, তাতে আমার মনে হয় না উনি সুইসাইড করতে পারেন! ওঁর... কিছু মনে করবেন না, ড্রিঙ্ক করতেন। আমার মনে হয়, নেশায় বেসামাল হয়ে ছাদ থেকে পড়ে যান।"

"বেশ। আপনি আসুন। পরে দরকার হলে সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়? আচ্ছা, শুভব্রত নিশ্চয় চিৎকার করেছিল। আপনি কোনও শব্দ পাননি"

"না। পেলে বলতাম।"

হাসল সুবর্ণা। বেরিয়ে গেল ও।

কঙ্কা বুঝতে পারেনি যে ওকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ভেতরে ঢুকে একটু আনইজি ফিল করছিল। কৃপাসিন্ধু নরম গলায় কথা শুরু করল। মেয়েটিকে দেখে ওঁর প্রথম যে শব্দ মনে হল, তা হল বেচারি। হঠাৎ করে দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে ঝামেলায় পড়েছে।

"আপনি তো এখানে থাকেন না। ভাল লাগছে না বুঝতেই পারছি। বাড়ির পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে আছেন। কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। খুব সাধারণ প্রশ্ন।"

"বলুন।" কঙ্কা সোজাসুজি তাকাল। কৃপাসিন্ধুর কথা বলার ধরন ওর পছন্দ হয়েছে। ভদ্রলোক কড়া নিশ্চয়। কিন্তু মেজাজ অযথা ফুটিয়ে তোলার দিকে ঝোঁক নেই।

"যেদিন শুভব্রত মারা যায়, আপনি কোথায় ছিলেন?"

"দেখুন, ঠিক কখন উনি মারা যান, সেটা আমি জানি না। যেটা বুঝতে পেরেছি সকলের কথাবার্তা শুনে, সেটা হল উনি রাতের দিকেই সম্ভবত ছাদ থেকে পড়েন বা তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়। যা হয়েছে আর কি। আমি সন্ধের পর শুধু নয়, সারাদিনই দিদির ছেলের সঙ্গে ঘরের ভেতরে থাকি। ওকে সামলাতে হয়। সেদিনও সারাক্ষণ ওকে নিয়েই ছিলাম। ঘটনার সময়েও নিশ্চয় বাবুইকে নিয়ে ছিলাম।"

"কোনও শব্দ পাননি? কোনও আওয়াজ? চিৎকার? আর্তনাদের মত বা ওই রকম কিছু? একটু মনে করুন।"

"আওয়াজ? না তো।"

"আশ্চর্য! একজন মানুষ মৃত্যুর বিভীষিকায় চিৎকার করে উঠেছিল নিশ্চয়! অথচ শুভব্রতর চিৎকার আপনারা কেউ শুনতে পেলেন না?"

"আসলে, আমি বাড়ির ভেতরদিকে থাকি। দিদির শ্বাশুড়ি অসুস্থ বলে বাবুইকে আটকে রাখতে হয় যাতে ও গিয়ে ঠামুনকে বিরক্ত না করে। ওদিকে চিৎকার পৌঁছয় না হয়তো। শীতকাল বলে জানালা দরজা বন্ধ থাকে। বাইরের আওয়াজ এমনিতেই ঘরের ভেতরে ঢোকে না। সেদিন খুব কুয়াশা ছিল। দুপুর থেকেই জানালা দরজা বন্ধ ছিল।"

"আপনি শেষ কখন শুভব্রতকে দেখেছেন?"

"শেষবার? গত পরশু কি তার আগের দিন।"

"ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে নিশ্চয় এক বা একাধিকবার?"

"কথা?" কঙ্কা আশ্চর্য চোখে তাকাল, "কথা হবে কী করে? উনি কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না। আমার সঙ্গে আলাপই হয়নি!"

"উনি কথাবার্তা বলতেন না? মাথার গোলমাল ছিল নাকি?"

"না, না। সেকথা নয়। উনি খুব রাগি ছিলেন বলে শুনেছি। কাউকে পছন্দ করতেন না। যখনই বাড়িতে আসতেন, ঝামেলা করতেন। কিছু ব্যাপার আমার সামনেই ঘটেছে। ওঁর মায়ের সঙ্গেও খুব খারাপ বিহেভ করতেন।"

"সে কি! অসুস্থ মানুষের সঙ্গেও?"

কৃপাসিন্ধুর তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করল কঙ্কা। কী দরকার বাবা এতসব ঝামেলায় জড়িয়ে। পরে দিদি আবার বকাবকি না করে।

কৃপাসিন্ধ বুঝতে পারল কঙ্কাকে। মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে নিল। ভয় পেয়েছে ভেতরে ভেতরে।

"আচ্ছা, আপনি আসুন। দরকার হলে ফের ডাকব।"

নীলম ঘরে ঢুকে দেখে নিল সবাইকে। কার গলা পাচ্ছিল বাইরে থেকে বোঝার চেষ্টা করল।

"আপনার নাম?"

"নীলম। নীলম হাইত।"

"আপনার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক?"

"আমি এ বাড়ির আশ্রিতা। বাবা-মা বন্যায় মারা যান। নানা জায়গা ঘুরে এখানে এসেছি।"

"সেটা কবে?"

"বছরখানেক হল।"

"এখানে এলেন কোন সূত্রে?"

"বড়মণি মানে এ বাড়ির মা, উনি হাওয়া বদলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হরিদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা হয়। তখন অন্য একটি পরিবারের কাছে ছিলাম আশ্রিতা হয়ে। বড়মণি আমার দুর্দশা দেখে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।"

"আপনি আসার পরে কি সুখময়বাবুর মৃত্যু হয়?"

"আমি এখানে আসার আগেই। বড়মণি ঘটনার পরে অসুস্থ হন। তখন ওকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।"

"উনি কার সঙ্গে গিয়েছিলেন?"

"জ্যাঠামশাই মানসরঞ্জনবাবু, আর ম্যানেজারবাবু। সঙ্গে একজন অচেনা বৃদ্ধা ছিলেন। আমি তাঁকে আর কখনই দেখিনি।"

"তিনি কে?"

"জানি না। কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি। বেশি কৌতূহল দেখানো বড়মণি পছন্দ করতেন না।"

"জ্যাঠামশাই?"

"উনি এ বাড়ির বাবু মানে সুখময়বাবুর কাজিন।"

"আই সি। উনি কোথায় থাকেন?"

"এ বাড়িরই অন্য অংশে। পেছনদিকে।"

"আচ্ছা, হাওয়া বদলাতে গিয়ে উনি একটু সুস্থ হন, তাই না?"

"উনি কখনও সুস্থ। কখনও খুব অসুস্থ। ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ আমি দেখিনি।"

"আপনি এখানে এসে শুভব্রতকে কেমন দেখেছিলেন?"

"উনি, বরাবর একই রকম শুনেছি। একগুঁইয়ে, বদমেজাজি। বাড়ি এসে ভাঙচুর করতে আমিও দেখেছি।"

"আপনার সঙ্গে নিশ্চয় কথা হয়েছে?"

মুহূর্তে চোখ তুলে তাকাল নীলম। অপূর্ব দুটো চোখ। যেন তুলির টানে পাখি এসে বসেছে।

"না। কখনও বলেছেন বৈকি। কিন্তু নেহাতই প্রয়োজনীয় কথা। অদরকারে কথা বলার লোক উনি ছিলেন না।"

"ওঁর চারিত্রিক দোষ ছিল?"

"মানে?"

"স্ত্রীলোকঘটিত কিছু...?"

"আমি শুনিনি। দেখিওনি। বাইরে কিছু করে থাকলে অবশ্য আমার জানার কথা নয়।"

"দু' ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ভালই তো।"

"আর একটি কথা, মৃত্যুর সময়ে চিৎকার করেছিলেন শুভব্রত?"

"করলেও শুনতে পাইনি। দেখেছেন হয়তো বাড়ির সামনে একটা রিকশাস্ট্যান্ড রয়েছে। ওরা সন্ধের পরে গানবাজনা করে। রোজ। কিচ্ছু শোনা যায় না।"

"বেশ। আসুন আপনি।"

নীলম উঠে দাঁড়াল। কিছু বলবে বলবে করে খানিক অপেক্ষা করল। শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ালো। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক দেখল। কৃপাসিন্ধু অপেক্ষা করছিল। নীলম অস্থির চোখে তাকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা। বড় বড় চোখ। টেনে চুল আঁচড়ে বড় খোঁপা বাঁধা। কালো চেহারায় চিকন আভা। ঢুকেই এক গাল হাসল, "আমার নাম পদ্ম। পদ্ম বর্মণ।"

"বসো। কতদিন ধরে আছ এ বাড়িতে?"

"তা আমার মনে নেই। বড়মণি বলে, —"তুই যখন এলি, তোর দুধের দাঁত সবে পড়েছে।"

"অনেক ছোট বয়সে এসেছ। তুমি তাহলে অনেক কিছু জান। তোমার মত করে কেউ জানে না।"

"হুঃ, জানি না আবার! সব জানি। এ বাড়ির হাঁড়ির খবর জানি। এই যে ছোটদাবাবু, এর মৃত্যু যে এভাবে হবে, সেটাও জানতাম বাবু।"

"তাই নাকি?"

"যা কুচুটে লোক ছিল গো! সে কী করে ভালভাবে বেঁচে থাকবে বল? বাড়ির ভেতরের যা অশান্তি, সব ওর জন্য। তবে কথা আছে এর মধ্যে। ছোটদাবাবুকে কেউ ভালবাসতো না। একজন ছাড়া। সে হল তার মা। তা সে বা কত করবে? অসুস্থ মানুষের... ছেড়ে দিন বাবু। অন্যায্য কথা সব। তাছাড়া বড়লোকের বাড়ির নানা কথা থাকে। সেসব বলতে নেই। এত লোক এই বাড়িতে। কে আসে, কে যায়, বুঝতে পারি না। এমনও হল একবার, বর বউ ছিল। কাজ করত। বর হরিরাম বাগান দেখাশোনার কাজ করতো। বউ নলিতা রান্নাবান্না করতো। একদিন নলিতা কোথায় চলে গেল কে জানে। হরিরামের সে কী কান্না রে বাপ! তখন বড়মণি হরিরামকে ক'টা দিন বাইরে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল। দেশের বাড়িতে চলে গেল হরিরাম। ওখানে ওর মেয়ে ছিল। কিন্তু হরিরাম আর ফিরে আসেনি। এতদিনে মরে গিয়েছে মনে হয়! নলিতাও আসেনি।"

"বড়বাবু কী ভাবে মারা গেলেন?"

"বাপরে! কী কাণ্ড! মরে যাওয়ার দু' ঘণ্টা আগেও মজা করে লুচি খেলেন। ঠাট্টা করলেন— লুচি পুরি খাওরে ভাই। বাবুর মা নাকি টিফিনকারি নামে একটা খাবার বানাতেন। কেমন বলুন দেখি? একটা পুরি বেলে রাখলেন। তার ওপরে কষা মাংসের কিমা, ডিমের কুচি, এসব দিয়ে ভরে রাখলেন। আরেকটা পুরি বেলে ওপর দিয়ে ঢেকে দিলেন ঢাকনার মত করে। দুটো পুরির জোড়া করতে মুড়ে দিতে হবে চারপাশে। এবারে গরম ঘিয়ে ভেজে তুলতে হবে।"

"বাহ! এই গল্প করেছিলেন বুঝি?"

"সেদিন লুচি খেতে খেতে এই গল্প করলেন তো। পুরো মনে আছে আমার! আমাকে বলেছিলেন, "পদ্ম, ব্রজেনকে যদি বিয়ে করিস...!" এই যাহ!" জিভ কেটে উঠে দাঁড়াল পদ্ম।

"ও, ব্রজেনের সঙ্গে বুঝি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

"বড়বাবু থাকতে বলেছিলেন।"

"এখনও করতে পার।"

"হুম। ব্রজেনও তাই বলে।"

"তাহলে দেরি করছ কেন?"

চমকে তাকাল পদ্ম। কপালের ঘাম মুছল আঁচল দিয়ে।

—পদ্ম, তুমি জান ছোটবাবুকে কে মেরেছে?

"জানলে বলে দিতাম বাবু। খারাপ হোক কী ভাল হোক, মেরে ফেলা কেন?"

"বড়দাবাবু মানে তোমাদের দেবব্রতবাবুর সঙ্গে ছোটদাবাবুর খুব ভাব ছিল?"

"ভাব? ইল্লি। দুজনে দুজনার মুখ দেখতো না।"

"কী করে বুঝলে?"

"আমি বুঝবো না? সারাদিন বাড়ির ভেতরে থাকি। কোথায় কী হল, সবই বলতে পারি। কিছুদিন ধরে বাড়িতে একটা ঝামেলা শুরু হয়েছিল। ছোটদাবাবু সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল। খুব গন্ডগোল হল। মিটিং হল বড়মণির ঘরে। পরে ঠিক হল, ছোটবাবুর ভাগ তাকেই দিয়ে দেওয়া হবে।"

"দেবব্রতবাবু কি ভাগ দিতে রাজি ছিলেন?"

"ধুরর! তাই কি আর দেয়? সকলেরই লোভ আছে বুঝলেন বাবু! আসলে জ্যাঠাবাবুর কথা মানতে হল। উনি অর্ডার দিলেন ভাগ দে দাও। ব্যাস। আসলে জ্যাঠাবাবুকে সকলে মান্য করে। উনি বললে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। ভয় পায় ওনাকে।"

"আচ্ছা! বাহ্। খুব ভাল করে ভেবে বল, এসব কথা কতদিন আগের কথা?"

"ওইতো, যেদিন ছাদে ভূত দেখলাম, তার ক'টাদিন পরেই!"

"ওহ, ছাদে ভূত দেখেছ তুমি? কখন? কবে?"

"সন্ধে লেগেছে। কি কুয়াশা ছিল বাপরে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। ছাদে গেলাম মৌরি তুলে আনতে। নীলমদিদি বলেছিল বোধহয় মৌরি আনতে। যাকগে, তো মৌরি আনতে গেছি, আলসেতে হেলান দেওয়া একটা ছায়া যেন নড়ে উঠল। ছাদে জলের ট্যাঙ্কটা দেখেছেন? ঠিক তার ওপাশে! উহ! কী ভয়! দেখুন আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে!"

"তাহলে, এ বাড়িতে ভূত আছে? একদিনই দেখেছ?"

"অনেক দেখেছি। শুধু আমি কেন, ফুলমনিও দেখেছে!"

"আচ্ছা, তুমি গিয়ে ফুলমনিকে পাঠিয়ে দাও।"

"ও খুব অসুস্থ বাবু। সেবারে ভূত দেখার পরে সেই যে অসুস্থ হল, আর সুস্থ হচ্ছে না। কোবরেজ দেখছে। ওর মেয়ে বাদলা তো এখন এ বাড়ির পুজোর ফুল দিচ্ছে! ও আসতে পারলে তবে তো ফুল দেবে!"

"বাদলাকে ডেকে দাও।"

পদ্ম বের হতেই হাসিখুশি একটি মেয়ে ঢুকলো ঘরে। বছর পনের-ষোল বয়স।

"তুমি বুঝি বাদলা? এ বাড়িতে ফুল দাও? সেদিন ভূত দেখেছিলে?"

বাদলা হড়বড় করে কথা বলে। আগের ঘটনা পরের ঘটনা সাজিয়ে নিলে বোঝা যায় সেদিন ও ভূত দেখেনি। লাশটাকেই ভূত ভেবেছিল।

কৃপাসিন্ধু একমনে বাদলার কথা শুনছিল, "তাহলে তোমার ভূত দেখা হল না।"

হাসল বাদলা। কৃপাসিন্ধু ওকে বিদায় জানিয়ে দিতেই বাদলা চলে গেল। এরপরে যিনি এলেন, তাঁকে দেখে কৃপাসিন্ধু বুঝে ফেলল ইনি হলেন ম্যানেজারবাবু। জনার্দন গোস্বামী।

"কতবছর ধরে আছেন এখানে?"

"তা ধরুন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। বড়বাবুর সময় থেকেই আছি।" ম্যানেজারবাবুর গলার স্বরটা ফ্যাঁসফেঁসে। যেন সর্দি লেগেছে।

"বড়বাবু, অর্থাৎ সুখময়বাবুর সঙ্গে কাজ করেছেন, আবার তাঁর ছেলের সঙ্গেও কাজ করছেন। তুলনামূলকভাবে কার কাছে আপনি স্বচ্ছন্দ বলে মনে করেন?"

জনার্দন চশমার কাচ মুছলেন। ফের যথাস্থানে বসিয়ে তাকালেন কৃপাসিন্ধুর দিকে।

"বলুন।"

"সেকথা ঠিকঠাক বলাটা খুব সহজ নয় বুঝলেন। এঁরা দুজনেই আমার অন্নদাতা। এঁদের কারও সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।"

"অর্থাৎ আপনি জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন? এর অর্থ, আপনি এঁদের যে কোনও একজনের কাজে খুশি নন। আচ্ছা, দেবব্রতবাবু আপনাকে বিশ্বাস করেন কি? নিশ্চিন্তে আপনাকে সব গোপন খবর শেয়ার করেন? ব্যবসায় অনেক গোপন কথা থাকে। উনি কি কিছু লুকোন আপনাকে?"

"না। বড়বাবুর মৃত্যুর পরে দেবব্রতবাবু ইচ্ছে করলেই আমাকে সরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু উনি সেটা করেননি। আমার সংসার এই বাড়ির দয়াতে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমি মিথ্যে বলতে পারব না। হিসেবপত্রে ভুল থাকলে উনি ধরে ফেলতেন। সে বুদ্ধি ওঁর আছে।"

"হরিদ্বার গিয়েছিলেন শুনলাম। কতদিন আগে?"

—গতবছর। বড়মণি অসুস্থ হলেন। তারপর...!"

"তখন নীলমকে পেয়েছিলেন?"

—হ্যাঁ। বড়মণি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।"

"বেশ। আপনি আসুন।"

"বাবু!" জনার্দনের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে যোগিন। ভয় বিহ্বল চোখ।

"তুমি? কী নাম?"

"যোগিন, বাবু! এ বাড়িতে একটা কেউ ঢুকেছে বাবু। পেছনের দরজা দিয়ে।"

"কে ঢুকেছে?"

"ঘোমটা দেওয়া ছিল। মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু এই মহিলাকে আমি আগেও একবার দেখেছি। বড়মণির ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোনদিকে চলে গেল বুঝতে পারিনি। কিন্তু এবারে দেখেছি, বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে। বড়মণির ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। আমাকে দেখতে পায়নি।"

কৃপাসিন্ধুর ইঙ্গিতে দুজন পুলিশকে নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার বড়মণির ঘরের দিকে রওনা হলেন। দেবব্রত কাছাকাছি ছিল। ওকেও ডেকে নিলেন অফিসার, "চলুন, আপনার মায়ের ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখেছে যোগিন।"

"মায়ের ঘরে? সে কে?" দ্রুত হাঁটতে থাকে দেবব্রত —তাড়াতাড়ি আসুন অফিসার।

বড়মণির ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে একা বসে বসে অদ্ভুতভাবে হাসছেন বড়মণি। সে হাসিতে কান্না মেশানো।

দেবব্রত এগিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল, "মা, কে এসেছিল এ ঘরে? তোমার কোনও ক্ষতি করতে চেয়েছিল কি?"

জবালা জবাব দেন না। নাগাড়ে হাসছেন। ফোঁটা ফোঁটা জল গাল বেয়ে নেমে আসছে। দেবব্রতকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না।

কিন্তু কে এসেছিল এ ঘরে? বিষয়টা যথেষ্ট চিন্তার। বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে কে ঢুকে পড়ল? কেন? কৃপাসিন্ধু দেখল জবালা হৃদয় নিংড়ে কাঁদছেন। নিঃশব্দ কান্না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না সত্যি কেউ এসেছিল কিনা। আবার একথাও সত্যি যোগিন মিথ্যে বলবে কেন? সম্পূর্ণ বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া গেল না। অদ্ভুত কাণ্ড। তাহলে কি যোগিন মিথ্যে বলেছে? উদ্দেশ্য কী ওর?

ফের ঘরে পৌঁছে যোগিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেল কৃপাসিন্ধু, "কতদিন এখানে আছ?"

"পাঁচবছর হবে।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি বাবু, ফালাকাটায়। নর্থবেঙ্গলে।"

"তুমি বহুদিন ধরে আছ। তাহলে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে।"

"না বাবু, আমি কিছু জানি না।" যোগিন কেঁদে ফেলল, "যে যা করতে বলে, করে দিই। ফাইফরমাশ খাটি।"

"যোগিন," ফিসফিস করে কৃপাসিন্ধু, "তুমি জান ছোটবাবুকে কে মেরেছিল!"

"না, না বাবু। আমি জানি না। সে রাতে আমি ব্রজেনদার সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম।"

"তুমি নর্থবেঙ্গল থেকে এখানে এসেছ কাজের খোঁজ করতে?"

"আমার পাড়ার একজন এসে বলেছিল, যোগিন, চাকরি করবি? অনেক টাকা পাবি। কিন্তু কলকাতায় যেতে হবে। আমি খুশিমনে চলে এলাম তার সঙ্গে। শিয়ালদায় নেমে গাড়ি করে আমাকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। কেমন গোডাউন টাইপের বাড়ি। চারজন লোক ছিল। গুন্ডা টাইপের। তাদের সঙ্গে আমার পাড়ার লোকটির চুপচুপি কী কথা হল। তারা বলল— আচ্ছা, একে চাকরি জোগাড় করে দেব। ...সেদিন রাতের বেলা তাদের মধ্যে কী নিয়ে দর কষাকষি হচ্ছিল। পরে তারা আমার পাড়ার লোকটির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল— এই নাও এক হাজার। টাকা নিয়ে সে লোকটি চলে যাচ্ছিল। আমাকে বলল— বসে থাক, আমি আসছি। কিন্তু গেল তো গেলই। আর আসে না! আমি খুব ভয় পেলাম।

রাতে দুজন লোক কোথায় চলে গেল। বাকি দুজন ছিল। রাতে আমাকে নিয়ে ঘুমোল ওরা। গভীর রাতে আমি পালালাম। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি, জানি না। ম্যানেজারবাবু শেষরাতে ফিরছিলেন কোথা থেকে, রাস্তায় আমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে নিয়ে এলেন বাড়িতে।"

"তোমার পাড়ার লোক তোমাকে কলকাতায় নিয়ে এল? যেখানে নিয়ে গেল, সে জায়গার নাম জান?"

কে এসেছিল এ ঘরে? বিষয়টা যথেষ্ট চিন্তার। বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে কে ঢুকে পড়ল? কেন? কৃপাসিন্ধু দেখল জবালা হৃদয় নিংড়ে কাঁদছেন। নিঃশব্দ কান্না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না সত্যি কেউ এসেছিল কিনা। আবার একথাও সত্যি যোগিন মিথ্যে বলবে কেন? সম্পূর্ণ বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া গেল না। অদ্ভুত কাণ্ড। তাহলে কি যোগিন মিথ্যে বলেছে? উদ্দেশ্য কী ওর?

"না, আমি কিছুই চিনি না তখন।"

"তুমি পালিয়ে ম্যানেজারবাবুর হাতে পড়লে। তাঁকে বলে তুমি নিজের বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে না কেন?"

"ভয়ে। যদি ফের আমাকে ধরে নিয়ে আসে! আমার সৎ মা ওদের সঙ্গে যোগসাজস করে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। কাজের কথা বলে। গুন্ডাদের কথা থেকে সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম। আমি বাড়ি ফিরে গেলে ফের আমাকে অন্য কোথাও পাচার করে দিত। তাই বাড়িতে ফিরিনি।"

"আচ্ছা, বেশ। রাতে পালালে, তারপর তোমার সঙ্গে কখন ম্যানেজারবাবুর দেখা হল?"

"শেষরাতে।"

"শেষরাতে ম্যানেজারবাবু কোথা গিয়েছিলেন? বিমানবাবু, জনার্দনবাবুকে আসতে বলুন।"

ব্যস্ত হয়ে এলেন ম্যানেজারবাবু। চকিত দৃষ্টি।

"বলুন স্যার।"

"যোগিনকে আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

"একদিন বাজারে যাচ্ছি। একটা অল্পবয়সী ছেলে এসে কাজ চাইল। খুব কষ্ট হল। ময়লা জামাকাপড়। খেতে পায়নি এমন চেহারা। বড়মণির কাছে নিয়ে গেলাম। উনি রেখে দিলেন। ফাইফরমাশ খাটার একটা লোক দরকার ছিল।"

"ক'টা নাগাদ দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে?"

"এই, ধরুন বেলা এগারোটা হবে।"

"ও কার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল, সে কথা বলেছিল?"

"হ্যাঁ, খুব ভয়ের ঘটনা। নিশ্চয় কিডনি চোরদের পাল্লায় পড়েছিল। খুব বেঁচেছে।"

"আপনি আসুন এখন।"

ম্যানেজারবাবু অবাক মুখে চলে গেলেন। যেতে যেতে বার দুই যোগিনের দিকে ফিরে তাকালেন।

"যোগিন, তোমার পাড়ার লোকটির নাম কী?" কৃপাসিন্ধু ম্যানেজারবাবুর চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। উনি চলে যেতেই ঘুরে বসেছে কৃপাসিন্ধু, "তুমি বললে মাঝরাতে দেখা হয়েছিল ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। উনি বলছেন বেলা এগারোটার দিকে। কে মিথ্যে বলছে যোগিন?"

"আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। আমি বোধহয় ভয়ে সময়টা গোলমাল করে ফেলেছি। বেলার দিকেই দেখা হয়েছিল মনে হচ্ছে।"

"পাড়ার সেই লোকটির নাম বল। মনে কর। কৃপাসিন্ধু একদৃষ্টে যোগিনকে লক্ষ্য করছিল। যোগিন সে দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল— মনে পড়েছে। সুরেন বর্মণ। আমি যাই?" যোগিন কৃপাসিন্ধুর সম্মতি পেতেই পর্দা সরিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

যোগিনের পরে যে ঢুকল, তার মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই।

"তোমার নাম?"

"ব্রজেন। ব্রজেন পাল।"

"এখানে কী কাজ কর?"

"রান্না করি।"

"এর আগে কোথায় চাকরি করেছ?"

"জলপাইমোড়ে। নববাবুর হোটেলে।"

"জলপাইমোড়টা কোথায়?"

"শিলিগুড়িতে।"

"শিলিগুড়ি থেকে এখানে এসেছ কেন? নববাবু রাখলেন না?"

"মাইনে পোষাচ্ছিল না। বাড়াতে বলাতে ছাড়িয়ে দিলেন।"

"এ বাড়িতে এলে কী ভাবে?"

"ম্যানেজারবাবুর কাছে চাকরি চেয়েছিলাম।"

"ফের ম্যানেজারবাবু? ওঁর সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল?"

"নববাবুর চাকরি ছেড়ে বাড়িতে চলে গেলাম। আমার জামাইবাবু এখানে নিয়ে এল। বলেছিল, ওর সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর ভাল যোগাযোগ আছে। উনি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। সে আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এল। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিল। চাকরি হল। রান্নার লোকের দরকার ছিল এখানে। আমি বহাল হলাম।"

"তোমার বাড়ি কোথায় ব্রজেন?"

"আজ্ঞে, জটেশ্বর। ফালাকাটা চেনেন? তার কাছে। কোচবিহারের কাছে আর কি। কোচবিহার চেনেন? রাজবাড়ি? রাসমেলা?"

"তোমার জামাইবাবু যে, তার নাম কী?" কৃপাসিন্ধুর ভ্রু কুঁচকে উঠেছে।

"আজ্ঞে, সুরেন বর্মণ।"

(ক্রমশ)

গল্প

পাইনের পাহাড়ে আদুরে রোদ্দুরে

মৌসুমী চৌধুরী

ঊর্মিকে আজ আনতে যাচ্ছে সুবর্ণা। পুরো শীতের ছুটিটা ঊর্মি থাকবে তার কাছে। ভেতরটা কেমন একটা রিনঝিন সুখে দুলে উঠছে বারবার! ঊর্মি কে হয় তার? কেউ তো হয় না, কোনও সম্পর্ক তো নেই! কিন্তু ঊর্মি যে তার সব, সে না থাকলে জীবনটা ভেসে যেত তার। ঊর্মি তার জীবনের গভীর অপমানের এক নাম, তীব্র সংগ্রামের নাম, গভীর ভালবাসারও নাম।

সুবর্ণার জীবনে ঊর্মির আসাটা ছিল অনেকটা কালবৈশাখী আছড়ে পড়ার মত। আবার বহু-দিনের স্নেহ-বুভুক্ষু টুটাফুটা বুকে সোঁদা গন্ধ তোলা প্রথম বৃষ্টির মত। আজ সে ঊর্মির মা হয়ে উঠেছে। কাজটা করা যে খুব সোজা ছিল তা নয়। চলেছিল দীর্ঘ টানাপোড়েনও।

প্রতিবার যখন গাড়িটা সমতল থেকে পাহাড়ে ওঠে, বড় প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি অনুভব করে সুবর্ণা। সবুজ পাহাড়ের খাঁজে লেগে থাকা থোকা থোকা মেঘগুলো যেন হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। শীতল বাতাস চোখে মুখে বুলিয়ে দেয় শান্তিস্পর্শ। পাহাড়ি পথের দু'ধারের ঘন সবুজ অরণ্য দু'চোখে মাখিয়ে দেয় স্বপ্নাঞ্জন। পাহাড় সুন্দরীর সবুজ আঁচলে ঢেকে যায় সুবর্ণার যত দুঃখ-ক্ষত-শোক!

ঊর্মিকে নিতে দার্জিলিং যাচ্ছে সুবর্ণা। ছুটিতে তাকে সে নিজের কাছে রাখে প্রতিবারই। ছুটিতে ঊর্মিকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, তার প্রিয় পদগুলি রেঁধে খাওয়ানো, চুটিয়ে শপিং করা, রাত জেগে গল্প করা সুবর্ণার বড্ড প্রিয় ছুটি-যাপন। ঊর্মি ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু কাঁটা বাছবেন না বাবু। খেতে দেবার আগে কাঁটা ছাড়িয়ে রেডি করে দিতে হয় সুবর্ণাকে। মানদা মাসির কাছ থেকে কচু শাক, নটে শাক, লাউ শাক, কলমি শাক কিনে রেখেছে, মোচা আর থোড়ও। শাক খেতে বড় ভালবাসে মেয়েটা, আর চিংড়ি দিয়ে মোচা ঘণ্ট, থোড়-চচ্চড়ি। হোস্টেলে এ সব তো খেতে পায় না বেচারা। ও যে ক'দিন থাকবে নিজে হাতেই রাঁধবে সুবর্ণা। বিনুর মা সে ক'দিন থাকবে তার সাহায্যকারী হিসেবে।

এবার ঊর্মিকে নিয়ে একটু ইতিহাস ছুঁতে চায় সে। কাছাকাছি মুর্শিদাবাদ আর গৌড় মালদায় যাবে, সেইরকমই প্ল্যান করা আছে। হাজার-দুয়ারি প্যালেস, কাটরা মসজিদ, ইমামবাড়া, মতিঝিল, জগৎ শেঠের বাড়ি, সিরাজউদ্দলার সমাধি, পাতালেশ্বর মন্দির, আদিনা মসজিদ, ফিরোজ মিনার ইত্যাদি খুঁটিনাটি ঘুরিয়ে দেখাবে ঊর্মিকে। ঊর্মির একটু ইতিহাস ভীতি আছে। তাই ভারতের ইতিহাস ও তার অতীত ঐতিহ্যকে হাতে-কলমে তার কাছে তুলে ধরতে চায় সুবর্ণা। এভাবে তার ভীতিটা অনেকটাই কেটে যাবে বলে মনে করে সে। আসলে সুবর্ণা চায় ঊর্মির শিক্ষাটা হোক ভেতর থেকে, শুধু কাগুজে শিক্ষা নয়।

শীতের ছুটিটাতে শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের জেলখানা থেকে মুক্তি নিতে না পারলেও প্রাণ বড় হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর তো আবার সেই কলেজ, ক্লায়েন্ট মিট, ছাত্র পড়ানো, ছক-বাঁধা জীবন। শীতকালেই ঊর্মির স্কুলে ছুটিটা একটু বেশি থাকে বলে এই সময়টা কলেজ থেকে ছুটি নেয় সুবর্ণা। আগে থেকেই দিয়ে রাখে ছুটির দরখাস্ত। ঊর্মির জন্মের পর সুবর্ণা টানা ছ'মাস ছুটি নিয়েছিল। একরত্তি মেয়েটাকে আয়ার কাছে রেখে কাজে জয়েন করতে চায় নি সে। সে সময় দিনরাতগুলি যাপিত হত বাচ্চার পরিচর্যায়। শীতের রোদে ঊর্মিকে শুইয়ে সুবর্ণা যখন খাঁটি সর্ষের তেল মালিশ করত, তখন খিল খিল করে হেসে উঠত সে। মাটির পৃথিবীতে যেন নেমে আসত স্বর্গ! আর সুবর্ণার পাথুরে বুক চিরে বয়ে যেত তিরতিরে এক পাহাড়ি ঝোরা। নাহ ঊর্মিকে মা ডাকতে শেখায় নি সুবর্ণা। চার-মাস বয়স থেকে মেয়েটা তাকে দেখলেই মাম মাম করত। তারপর যখন বোঝার বয়স হল তখন থেকে সুবর্ণাকে মামনি বলে ডাকে সে।

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ঊর্মির দেখভাল নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না সুবর্ণার। অভিজ্ঞ হাতে মা সব সামলে নিতেন। মায় ঊর্মির পড়াশোনাও। বাড়ির কাছেই স্কুলে তাকে নার্সারিতে ভর্তি করেছিল। মা-ই স্কুলে নিয়ে যেতেন, নিয়ে আসতেন। কিন্তু মা মারা যেতে একদম একা হয়ে গেল সুবর্ণা। তাঁর ব্যস্ততম জীবনে ঊর্মিকে ঠিকমত সময় দিতে পারছিল না। নিরুপায় তখনই মাত্র আট বছর বয়সে দার্জিলিং-এর 'সেন্ট পলস স্কুল'-এ তাকে ভর্তি করে দেয়। সেই থেকে এই কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলে মানুষ হচ্ছে সে। এ বছর ঊর্মি ক্লাস টেনে উঠেছে। সামনেই তার 'বোর্ড এক্সাম'।

ঊর্মির চেহারায় এখন তার সুন্দরী মায়ের আদল। তবে মায়ের মত অতটা অপরূপা সুন্দরী না হলেও একটা আকর্ষণীয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তার চেহারায়।

গাড়িটা দ্রুত এগোচ্ছে দুধারে ছবির মতো পাহাড়ি দৃশ্যের বুক চিরে। সব স্মৃতিগুলো ঝাঁক বেঁধে ভিড় করছে সুবর্ণার বুকের চাতালে। আজও তীব্র একটা কষ্টবোধ আর অভিমান দলা পাকিয়ে উঠে আসে গলার কাছে। গত ছুটিতে ঊর্মি তার বাবার কথা জানতে চেয়েছিল। হঠাৎ জোর ধাক্কা নাড়িয়ে দিয়েছিল সুবর্ণার ভেতর ঘর! কথাটাকে এড়িয়ে অন্যদিকে কথায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সে।

কুণালকে ঊর্মির পিতৃত্বের ভার নিতে দেয় নি সুবর্ণা। শুধু ঊর্মির বার্থ-সার্টিফিকেটে বাবার নামের জায়গায় কুণালের নামটা রেখেছে। ঊর্মির স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সিস্টার সিলভি জোনস অবশ্য জানেন ঊর্মির জন্মবৃত্তান্ত। তিনিই প্রতিদিন একটু একটু করে ঊর্মিকে তার বাবার কথা বুঝিয়ে বলবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তারপর আজ এই প্রথম ঊর্মির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সুবর্ণা। মনের অলিন্দে তাই ঝুলে আছে এক পাথর ভার।

কেমন করে কী হয়েছিল? কেন হয়েছিল? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না? এই জিজ্ঞাসাগুলো যেন হাজার হাতুড়ির ঘায়ে সুবর্ণার চিন্তা-শক্তিকে অসাড় করে দিয়েছিল সেদিন। চিন্তাগুলো কেমন ডাইনির মাথার জটের মত পাকিয়ে যাচ্ছিল। বোকার মত ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল রেণুর দিকে। রেণুই ঊর্মির জন্মদাত্রী মা। বার্থ সার্টিফিকেটেও এই নামটিই রেখেছে। ঊর্মি তো কেউই হয় না তার, কেউ না। মনটা হঠাৎ হু হু করে ওঠে।

সাবিত্রী মাসির মেয়ে রেণু ছিল মূক-বধির। রেণুকে নিয়ে সাবিত্রী মাসি যখন সুবর্ণাদের বাড়িতে কাজ করতে আসে তখন রেণু সবে বাইশ পেরিয়েছে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় রেণু ছিল তাই। উদ্ভিন্ন যৌবনা, ফুটন্ত এক ফুল যেন! সাবিত্রী মাসি ছিলেন সুবর্ণার শাশুড়ির খুব প্রিয় পাত্রী। তাই সুবর্ণা আর তার স্বামী কুণাল দুজনেই তাদের সংসারের সমস্ত ভার এবং বৃদ্ধা মায়ের দায়িত্ব সাবিত্রী মাসীর ওপর ছেড়ে দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করত। বাড়ির নীচতলার একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল মা-মেয়ের।

দু'পাশের সবুজ পাহাড়ে একটু একটু করে বেলা পড়ে আসছে আর ইউ-টার্ন বেয়ে এগোচ্ছে সুবর্ণার গাড়িটা। উড়ছে কত রঙ বেরঙের প্রজাপতি। অনামী এক অভিমান ছড়িয়ে যাচ্ছে সুবর্ণার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। তবে কি সে বুঝতে ভুল করেছিল কুণালকে? কুণালের ভেতরে যে শুকনো দিঘিটা তৃষিত পড়েছিল, সে কি তাতে ভরে নিতে চেয়েছিল প্রাণদায়ী জল? কুণাল কি বাবা হতে চেয়েছিল?

দিনগুলো রাতগুলো তখন সব ভারি হয়ে চেপে বসত সুবর্ণার বুকের ওপর। খাঁ খাঁ করত মনের ঘর। শান্ত দুপুরে কিংবা কোনও বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় কচি কচি গলার হাজার বায়নাক্কা শুনতে খুব ইচ্ছে

হত। কষ্ট বুকে চেপে রেখে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল সাইকোলজির অধ্যাপিকা সুবর্ণা রায়। অধ্যাপিকা সুবর্ণার গবেষণার বিষয়টি ছিল 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ', যা প্রচলিত বিষয়গুলি থেকে একটু আলাদা। সেজন্য বিষয়টি সম্পর্কে সড়গড় হতে হয়েছিল তাঁকে। দূরশিক্ষার মাধ্যমে নিউ দিল্লির ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার থেকে থেকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে দু'বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করেছিল সে। শরীরের নানা ভঙ্গিমার মাধ্যমে যে শব্দমালা সাজিয়ে ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তা-ই হচ্ছে বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ। আর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বডি-ল্যাঙ্গুয়েজেরই একটা অংশ। মূলত মূক ও বধির লোকেদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। মজার ব্যাপার হল যে মুখের ভাষার মত ইশারার ভাষাও দেশ ও জাতিভেদে ভিন্ন হয়। এ মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে। মুখের ভাষার ক্ষেত্রে আমেরিকান ইংরেজি যেমন বিশ্বজুড়ে বহুল প্রচলিত, আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজও ইশারা ভাষার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়।

পড়াশোনা আর প্রাকটিস দুয়েরই খুব সুবিধা হয়েছিল সুবর্ণার। কারণ রেণুর ওপর তার শেখা বিদ্যে প্রয়োগ করতে পারত সে। রেণুকে সে শিখিয়েছিল অ্যামেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ-এ প্রাথমিক পর্যায়ের কথোপকথনের কিছু কৌশল। শিখিয়েছিল অ্যালফাবেটকে কীভাবে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রকাশ করা হয়, সংখ্যাকে কীভাবে সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, একইভাবে শিখিয়েছিল কাউন্টিংও। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে শিখিয়েছিল দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত কিছু সংকেত। রেণুর ব্যক্তিত্বে দ্রুত পরিবর্তন এসেছিল।

যাইহোক, কোর্স শেষ করার পর ফ্রিল্যান্সে কাজও শুরু করেছিল সুবর্ণা। ফলে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটছিল সময়টা। পড়ানোর বাইরে সাইন-ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্ট হিসেবে বহু জটিল কেস সমাধানের জন্য ডাক পড়ত তার। কখনও হসপিটালে, কখনও কোর্টে, কখনও বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা উকিলদের ব্যক্তিগত চেম্বারে। অটিস্টিক শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, মূক-বধির শিশু সবাইকে নিয়েই কাজ করছিল সে।

স্বামী কুণাল রায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। ভালবেসেই কুণালকে বিয়ে করেছিল সুবর্ণা। কুণালের খুড়তুতো বোন তুলি তার স্কুল-কলেজ জীবনের বান্ধবী। তুলির বিয়েতে কুণালের সাথে পরিচয়। তুলির বিয়ের দিন বাসর রাতে হেমন্তের গান গেয়েছিল কুণাল 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা'। গানের গলায় মুগ্ধ হয়ে কিছুটা তার প্রেমেও পড়েছিল। তারপর কিছুদিনের কোর্টশিপের পর তুলির মধ্যস্থতায় তাদের চার হাত এক হয়। বিয়ের পর কুণালের প্রথম পোস্টিং হয় মহারাষ্ট্রের পুনেতে। তখন থেকেই সন্তান চাইত কুণাল। কিন্তু নেট পাশ করবার পর কলেজে চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য তখন কিছুদিন সময় নিয়েছিল সুবর্ণাই।

তারপর সুবর্ণা কলেজে চাকরি পেতে তারা নিজেদের শহরে ফিরে এসেছিল। আর সে বছরই প্রথম মিসক্যারেজটি হয় সুবর্ণার। ধরা পড়ে ফাইব্রয়েটিক ইউটেরাস। বহু চিকিৎসার পরেও বার কয়েক মিসক্যারেজ হয় তার। আইভিএফ পদ্ধতিতেও সমস্যার সমাধান না হলে মুষড়ে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তারা।

ক্রমশ কুণাল আর সুবর্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়ল যার যার জীবনে, স্ব-কেন্দ্রিক আবর্তনে। অফিস, ট্যুর, অফিসের বাইরে ক্লাব, পার্টি, সর্বোপরি গানের তালিম, রেওয়াজ, গানের প্রোগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুণাল। দিনের শেষে কুণাল আর সুবর্ণার দেখা হত রাত গভীরে। আর স্বাভাবিকভাবেই কথা হত খুব কম। যে যার নিজের খুশির বৃত্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। সন্তানহীনতাই কি তাদের এমন করে তুলেছিল? গভীরে কোথাও কি মাটি আলগা হচ্ছিল ধীরে ধীরে?

তারই মধ্যে হঠাৎ গত হলেন সুবর্ণার শাশুড়ি মা। শ্রাদ্ধ শান্তি শেষে সাবিত্রী মাসি তার বোনকে কাজে বহাল করে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলেন। রেণুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন গ্রামের বাড়িতে জমি-জমা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা মেটাতে।

ওদিকে ততদিনে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্ট হিসেবে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সুবর্ণার। সেই সময়ই একদিন ফোন এল অ্যাডভোকেট লাহিড়ীর চেম্বার থেকে। একটি মূক বধির অবিবাহিতা মেয়ের মনের কথা জানতে হবে। মেয়েটি নাকি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পরিবারের অন্যান্যদের আকারে ইঙ্গিতে ঘটনাটি জানিয়েছে এই সপ্তাহখানেক আগে। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেয়েটির গোটা গ্রাম। গ্রামবাসীরাই এর প্রতিকার চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছে অ্যাডভোকেট লাহিড়ীর।

সেদিন অ্যাডভোকেট লাহিড়ীর চেম্বারে গিয়ে সাবিত্রী মাসি আর রেণুকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণা। তবে রেণুই সেই অন্তঃসত্ত্বা! অনেক দ্বিধা কাটিয়ে তার নিজস্ব ভাষায় রেণু সুবর্ণাকে জানিয়েছিল তার গর্ভের সন্তানের পিতা কুণাল রায়। আরও জানিয়েছিল গর্ভের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে চায় সে। জলভরা চোখে সুবর্ণার কাছে ক্ষমা চেয়ে কাতর মিনতি জানিয়েছিল রেণু। আর এতবড় কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুবর্ণার তখন বোধশক্তি সব অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তার দু'কানে যেন বাজছিল হাজার ঝিঁঝির ডাক।

সেই রাতেই মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল সুবর্ণা। কুণাল প্রাণপণে কিছু বোঝাতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু সুবর্ণার মাথার ভিতরে তখন শূন্যতার অনুভূতি। যেন কেউ কোথাও নেই! এক অদ্ভুত নীরবতায় নিজেকে মুড়ে যন্ত্রের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। সেদিন কুণালের কোনও কথাই কানে যায় নি তার।

রেণুকেও সুবর্ণা সাথে করে নিয়ে এসেছিল মায়ের বাড়িতে। ওই ক'মাস রেণুর পরিচর্যার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল পরম মমতায়। ঊর্মির জন্ম হওয়া অবধি রেণু সেখানেই ছিল। কিন্তু ঊর্মির জন্ম দিতে গিয়ে অ্যাক্লেমশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রেণুর। মৃত্যুশয্যায় সে তার বাচ্চার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল সুবর্ণাকে। হসপিটালে এসেছিল কুণাল। আগেই সহস্রবার ক্ষমা চেয়েছিল। অনেক কাকুতিমিনতি করে করেছিল বাচ্চাটিকে নিয়ে তার সাথে বাড়ি ফিরে যেতে। কোনও উত্তর না দিয়ে পাথরের মত বসেছিল সুবর্ণা। কুণালের সাথে ফেরে নি।

সেইদিন থেকে ঊর্মিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সুবর্ণার জীবন। তারপর এত বছরে আর কোনদিনও কুণালের মুখোমুখি হয় নি আর। আইনি ডিভোর্স তাদের হয় নি ঠিকই। কিন্তু মনের বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল সেই রাতেই।

সুবর্ণার গাড়িটা যখন ঊর্মির হস্টেল ক্যাম্পাসে ঢুকল তখন বেলা অনেক পড়ে এসেছে। পড়ন্ত দুপুরের লজ্জাবতী রোদ জঙ্গল-পাহাড়ের গায়ে শেষ আলোটুকু বুলিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ি পথের বাঁকে পাইনগাছের ছায়ারা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। একঝাঁক নাম না জানা পাখি ট্যা ট্যা করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঊর্মিকে নিয়ে যাবার পার্মিশান নেওয়ার জন্য প্রিন্সিপ্যাল সিলভি জোনসের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সুবর্ণা। হঠাৎ পিছন থেকে কচি কণ্ঠের উচ্চকিত হাসি শুনে উৎকর্ণ হল সে।

ঊর্মি! কিন্তু এ কী দৃশ্য দেখি?

পাশে হাসিমুখে বসে আছে কুণাল। পরনে সেই গাঢ় নীল রঙের পুলওভার! যা একদা সুবর্ণার ভীষণ প্রিয় ছিল। কুণালের ঘাড়ে মাথা রেখে ঊর্মির হাসি যেন পাহাড়ি ঝর্নার মত ঝরঝর ঝরে পড়ছে।

সুবর্ণা বুঝতে পারছিল এক বিস্ময় পাহাড়ি কুয়াশার মত আচমকা ঘিরে ধরেছে তাকে। তার মানে কুণাল তাকে না জানিয়ে কবে থেকে আসছে ঊর্মির কাছে! তার দিকে দুর্ভেদ্য এক দেওয়াল তুলে আড়ালে এ কী ধরনের মস্করা? কই ঊর্মিও তো গতবার দেখা হওয়ার পর কোনও হিন্ট দেয় নি তাকে! দুজনে মিলে শলা করে এতটা অন্ধকারে রেখে দিয়েছে তাকে? কপালের পাশের শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল সুবর্ণার। আকস্মিক বজ্রানলে যেন পুড়ে যেতে লাগল তার বুকের হাড় পাঁজর।

তৎক্ষণাৎ ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল সুবর্ণা। টলমল করছিল পা দুটো। ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না সে। শান্ত পাহাড়ি পটভূমিতে তখন আলো মরে গোধূলি নামছে। মরে যাচ্ছে উষ্ণতা। একটা শীতল কালো রাত যেন অজগরের মত গিলতে আসছে সুবর্ণাকে।

কে যেন হঠাৎ পেছন থেকে হাত টেনে ধরল তার। সে অনুভব করল কচি হাতের কোমল স্পর্শ! পিছন ফিরে দেখে ঊর্মির ডাগর দু'চোখ যেন জল ভরা দিঘি। ঊর্মি এক হাতে ধরে আছে সুবর্ণার হাত, আর অন্য হাতটি দিয়ে ধরে আছে কুণালকে। জল ভরা চোখের সেই দিঘিতে একরাশ মায়াময়তা ছড়িয়ে ঊর্মি বলছে, 'আমাদের ছেড়ে যেও না, মাম! ক্ষমা করে দাও না বাবাইকে...।'

উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে সকরুণ মিনতি মাখা চোখে অপলক চেয়ে আছে কুণালও!

অদূরে শিশির ভেজা বনজ ঘ্রাণ ছড়িয়ে সন্ধে নেমেছে। চ্যাপেল থেকে ভেসে আসছে প্রার্থনা সঙ্গীত— 'বিশ্ব পিতা তুমি হে প্রভু...'। হঠাৎ সুবর্ণার শক্ত করে আঁটা বন্ধ মনের দুয়ারে কী এক গভীর কষ্টবোধ আছড়ে পড়ল। মাম! ছোট্ট শব্দটি টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিচ্ছিল তার অসীম জেদী লড়াকু আত্মসম্মানকে!

সুবর্ণা পরিষ্কার টের পাচ্ছিল তার দু'গাল বেয়ে নামছে উষ্ণ স্রোত। চশমার কাচ ভরে উঠছে অভিমানী বাষ্পে।

আর ঊর্মি-কুণাল ঘাড় বেঁকিয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখে তার ঠোঁটের আড়ালে খুঁজে বেড়াচ্ছিল চিলতে হাসি।

সামনের এক ফালি মাঠটায় তখন শেষ বিকেলের আদুরে রোদ্দুর লুটোপুটি খাচ্ছে।

দলিত ও সংখ্যালঘু নারীদের বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

রাখি পুরকায়স্থ

অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একটি ন্যক্কারজনক সংবাদ উঠে এসেছিল। এক সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারের তিন বোনকে আসামের দরং জেলার বুড়া পুলিশ ফাঁড়িতে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ! অভিযোগ, গুয়াহাটিতে তাঁদের ভাই নাকি এক হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করেছে! বুড়া পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসির নির্মম লাথির আঘাতে এক বোনের গর্ভপাতও ঘটে যায়! সংবাদে প্রকাশ, চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর তাঁদের ভাই রফিকুল ইসলামের সঙ্গে দরংয়ের বুড়া এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক যুবতী পালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। ওই ঘটনার পর লাভ জেহাদের অভিযোগ তুলে দরং জেলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির করার চেষ্টা করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হিন্দু মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ পেয়ে ওসি মহেন্দ্র শর্মা গুয়াহাটির ছয় মাইল এলাকায় রফিকুলের বাড়িতে পুলিশ পাঠান। রফিকুল না থাকায় তাঁর এক গর্ভবতী বোনসহ তিন বোনকে বুড়া থানায় তুলে আনা হয়। থানায় পৌঁছাতেই তিন বোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। শুরু হয় নির্যাতন। ভাই রফিকুল ইসলাম ও সেই যুবতী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার অছিলায় লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করা শুরু হয়। পুলিশের মারের চোটে এক সময় অজ্ঞান হয়ে যান মেজবোন শারীরিক প্রতিবন্ধী রুমেলা বেগম। তারপর শুরু হয় ছোটবোন সুনয়ারা বেগমের উপর আক্রমণ। দু'মাসের গর্ভবতী সুনয়ারা নিজেকে বাঁচাতে ওসি মহেন্দ্র শর্মার পা ধরে কাতর অনুরোধ করেন। মত্ত মহেন্দ্রের তাতেও মন গলেনি। নৃশংসভাবে সুনয়ারার পেটে লাথি মারেন তিনি। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুনয়ারা। সেখানেই গর্ভপাত হয়ে যায় তাঁর। রক্তে ভেসে যায় থানার মেঝে। তার মধ্যেই হাজতে তিন বোনকে নগ্ন করে রাতভর নৃশংস অত্যাচার চালায় পুলিশ কর্মীরা। পরদিন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন তিন বোনকে এই বলে শাসানো হয়, এই নির্যাতনের কাহিনি বাইরে প্রকাশ করা হলে তাঁদের হত্যা করা হবে। বড় বোন মিনুয়ারা বেগম পরের দিনই দরং জেলার এসপির কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পরে তাঁদের ভাই রফিকুল থানায় এসে ধরা দেন। মিনুয়ারার অভিযোগ, পুলিশ কোনও প্রকার ব্যবস্থা নিতে রাজি হয়নি। উল্টে অভিযোগ তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বুড়া থানার ওসি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ঘটনার আট দিন পরেও হামলায় জড়িত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। পরে ওই তিন বোন স্থানীয় একটি নিউজ চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার পর বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। চারিদিকে শোরগোল শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর সমস্যায় পড়ে যায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। ওইদিনই তড়িঘড়ি বুড়া থানার ওসি মহেন্দ্র শর্মা ও কনস্টেবল বিনীতা বোরোকে সাসপেন্ড করা হয়।

আশ্চর্য ব্যাপার, অনেকে আবার নারী নির্যাতন ও শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করে চলেছেন! অথচ সকলেই জানেন, একজন গর্ভবতী মহিলার ওপর কী প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়েছে, যার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ সন্তানটি পৃথিবীর আলো দেখা থেকে বঞ্চিত হল! ভাবতে লজ্জা লাগে, একজন গর্ভবতী মহিলার ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার ঘটে গেল, কিন্তু তা জনগণের মধ্যে তেমন মারাত্মক রাগ-ক্ষোভ-প্রতিবাদের জন্ম দিল না! এমন কেন হল? মহিলাটি মুসলিম বলে? অথচ মুসলিম নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে অনেকেই তো বেশ তৎপর ছিলেন! তা, সেই ব্যক্তিরা মুসলিম নারীদের ওপর ঘটে চলা এমন সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন কী করে? বিষয়টি আমাদের নিঃসন্দেহে ভাবায়!

দাঙ্গা কিংবা গণপিটুনি, সর্বপ্রকার অত্যাচার-অপমানের মূল ভুক্তভোগী কিন্তু মহিলারাই। 'জয় শ্রীরাম' না বলায় চলতি বছরের ১৭ জুন গণপিটুনিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের তাবরেজ আনসারিকে। মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর চোট পান তিনি। ২২ জুন ২০১৯ হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাবরেজের। ঘটনাটা সংবাদ মাধ্যমে ছড়াতেই গোটা দেশ তোলপাড় হয়েছিল সেই সময়। নিন্দায় সরব হয়েছিলেন সকল শান্তিকামী মানবতাবাদী মানুষ। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির খুনের (৩০২) ধারার বদলে অনিচ্ছাকৃত খুনের (৩০৪) ধারায় চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু পুলিশ কেন অপেক্ষাকৃত লঘু ধারা দিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে? সম্প্রতি তাবরেজের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে। সেখানে জানা যায়, তাবরেজের মৃত্যু হয়েছিল স্ট্রোক বা হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে! তাবরেজের স্ত্রী শাহিস্তা পরভিন কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছেন। শুধু প্রতিবাদ নয়, ফের খুনের ধারা না জুড়লে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনেই আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন তাবরেজের স্ত্রী। গণপিটুনিতে তাবরেজের মৃত্যুর মাস দুয়েক আগেই বছর চব্বিশের পরভিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাবরেজের মৃত্যুর দু'দিন পর পরভিন জানতে পারেন তিনি সন্তানসম্ভবা। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর আকস্মিক মানসিক ধাক্কায় গর্ভপাত হয়ে যায় তাঁর। তারপরও গণপটুনিতে অভিযুক্তদের শাস্তির জন্য লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েননি পরভিন।

বিষয়টি স্পষ্ট, একমাত্র তাৎক্ষণিক তিন তালাকের ব্যাপারটিই আমাদের মনে রাগ-ক্ষোভ সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে, অথচ মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অন্যান্য বৈষম্যমূলক অন্যায় আচরণ একেবারেই আমাদের নজরে পড়ছে না! আইন করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধ সম্পর্কে উৎসাহীরা, যারা সংবাদ মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের 'উদ্ধারকর্তা' হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেই একই মানুষেরা মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ, ঘৃণাজাত অপরাধ এবং অন্যান্য বৈষমমূলক অপরাধের ঘটনায় চুপ করে থাকেন কী করে? আপনাদের কি মনে হয় না যে এই নির্যাতিত মহিলাগুলির আমার-আপনার সমর্থন এবং সহমর্মিতার প্রয়োজন? তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধের মত এই বিষয়গুলি কি ঠিক ততটা

প্রাসঙ্গিক নয়?

চলতি বছরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আরেকটি অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। রাজস্থানের চুরুর ঘটনা। একটি চুরির মামলায় পুলিশ ২২ বছরের একটি দলিত যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ৬ জুলাই রাতে পুলিশ হেফাজতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই মৃতের বৌদিকে চুরির মামলায় বেআইনিভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় আটকে রেখে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে মহিলাটিকে জয়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভাইয়ের মৃত্যুর পরও কেন তাঁর স্ত্রীকে ১০ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ আটকে রাখল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর স্বামী। ঘটনার কথা জানাজানি হলে চুরুর পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র কুমার শর্মাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বরখাস্ত করা হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, ময়নাতদন্তে জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই দলিত যুবকের!

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, খোলা জায়গায় মলত্যাগ করায় এক দলিত শিশু কন্যা রোশনি ও তার ভাইপো অবিনাশকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে স্থানীয় উচ্চবর্ণীয় গ্রামবাসীরা। হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভাওকেড়ি গ্রামে। অভিযোগ, ভোরে গ্রামের পঞ্চায়েত ভবনের সামনের রাস্তায় মলত্যাগ করেছিল ওই দুই শিশু। এ কারণে নির্মমভাবে পিটিয়ে তাদের মেরেই ফেলা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, এ ঘটনায় হাকিম সিং যাদব ও রামেশ্বর যাদব নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২০ ধারা (খুন) ছাড়াও এসসি/এসটি নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ অনুসারে পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে।

দলিতদের ওপর যারা অত্যাচার করে, তারা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে উঁচু তলার মানুষ। তাই দলিত সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করাটাই দুরূহ বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশও মামলা নিতে চায় না। মামলা করলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের কারণেই তা প্রত্যাহার করে নিতে হয় দলিতদের। দলিত মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ। সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বর্তমান ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। প্রতিদিন দলিত সম্প্রদায়ের ছয়জন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন! গত ১০ বছরে ভারতে দলিত নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে ৬৬ শতাংশ!

অকল্পনীয় মনে হলেও এগুলি হল আমাদের 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা' দেশের অতি বাস্তব ঘটনা। তাই সংখ্যালঘু ও দলিত মহিলাদের ন্যায়বিচারের এই লড়াইয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সকলের সমর্থন ও সংহতি প্রয়োজন। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের মত বিষয়ে যেভাবে উদ্বেগ দেখানো হয়েছে তা কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত কিংবা তেমন আশাব্যঞ্জক পরিমাণে উপস্থিত নয়। সংবাদ মাধ্যমগুলি তাৎক্ষণিক তিন তালাকের ওপর যেভাবে দিনের পর দিন অবিচ্ছিন্ন বিতর্ক চালিয়ে গিয়েছিল, এই ঘটনাগুলিকে অনেকক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলা হচ্ছে।

আমরা যদি কেবলমাত্র একটি-দুটি বাছাই অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী হতে আগ্রহী হই, অথচ প্রান্তিক মহিলাদের ওপর নিরন্তর ঘটে চলা অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারে নীরবতা বজায় রাখতে পছন্দ করি, তাহলে বৃহত্তর সমাজের কাছে তার কী বার্তা যায়? ভেবে দেখবেন সকলে। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত —দাঙ্গা, দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের সময় সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরাই। কোনও দোষ না থাকলেও নিজেদের জীবন ও সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে চরম মূল্য চোকাতে হয় তাঁদের। যুগে যুগে তাঁদের জীবন ও মানসম্মান নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলাকে সমপার্শকি ক্ষতি হিসেবেই দেখে এসেছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কি সেই লিঙ্গবৈষম্য দোষে দুষ্ট মানসিকতায় কোনও পরিবর্তন এসেছে? সমাজের

আইন করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধ সম্পর্কে উৎসাহীরা, যারা সংবাদ মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের 'উদ্ধারকর্তা' হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেই একই মানুষেরা মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ, ঘৃণাজাত অপরাধ এবং অন্যান্য বৈষমমূলক অপরাধের ঘটনায় চুপ করে থাকেন কী করে? আপনাদের কি মনে হয় না যে এই নির্যাতিত মহিলাগুলির আমার-আপনার সমর্থন এবং সহমর্মিতার প্রয়োজন? তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধের মত এই বিষয়গুলি কি ঠিক ততটা প্রাসঙ্গিক নয়?

বৃহত্তর চিত্রে নজর বোলালেই বোঝা যায়, নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন আশানুরূপ পরিবর্তন আসেনি। এমতাবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা মহিলাদের উচিত নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার, ন্যায় বিচারপ্রার্থী মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো; তাঁদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা কিংবা কমপক্ষে তাঁদের সাথে সংহতি প্রকাশ করা। ভুলে গেলে চলবে না, নারীবাদ কেবলমাত্র লিঙ্গসাম্যের কথাই বলে না, ধর্ম-ভাষা-জাতিগত পরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে লিঙ্গভিত্তিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথাও বলে। এ প্রসঙ্গে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছেন, 'যতক্ষণ না নিরাপদ অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্তদের মতই ক্ষোভ প্রকাশ করবে, ততক্ষণ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না'। তাই সার্বিকভাবে লিঙ্গসাম্য ও লিঙ্গভিত্তিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত পক্ষ অবলম্বন করতে পারি না। যদি আমার-আপনার লড়াইটি কেবলমাত্র সমাজের একটি বিশেষ অংশের নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ সেই লড়াই যদি ভারতীয় সমাজের সমস্ত প্রান্তিক নারীদের জন্য না হয়ে থাকে, লিঙ্গ সাম্য ও লিঙ্গ ভিত্তিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সেই ধারণাটিই তখন বৈষম্যমূলক' বলে চিহ্নিত হবে!

পুরাণ অফুরান

সূর্য পত্নী সংজ্ঞা এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী ও প্রেমিকার গল্প

শাঁওলি দে

পুরাণের নারী সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গেলে শুধু বিস্মিতই হতে হয়। সেই যুগে এমন সব জ্ঞানী, তেজস্বী নারীর দেখা মেলে যা আজও বিরল। প্রতিবাদী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর সংখ্যাও কম নয়। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বামী গৃহ এককথায় ত্যাগ করা নারী এযুগেও সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পুরাণের যুগে ছিল এমন এক তেজস্বী নারী, সংজ্ঞা যার নাম।

সংজ্ঞা ছিলেন বিশ্বস্থপতি দেব বিশ্বকর্মার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা ও সূর্যদেবের সহধর্মিনী। শৈশবকাল থেকেই সংজ্ঞা তেজস্বী, রূঢ় দেব দিবাকরের প্রেমে পাগল, তাঁকে দর্শন করে মুগ্ধ। যে প্রখর রোদের তেজে সবাই বিধ্বস্ত হয়, সেই রোদেও সংজ্ঞা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। সূর্যের উষ্ণ আলোয় সংজ্ঞা অনুভব করত সুর্যের সঙ্গে আলিঙ্গন। রোদের তেজ যেন তাঁর প্রতিটি রোমকূপে প্রবেশ করে তাঁকে আরও উজ্জ্বল করে তুলত। প্রখর রোদে আরও যেন সুন্দরী ও প্রদীপ্তা হয়ে উঠত সংজ্ঞা। সকলেই এই দেখে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করত।

কন্যা সংজ্ঞা বিবাহযোগ্যা হলে বিশ্বস্থপতি চিন্তিত হলেন, সেই সঙ্গে শঙ্কিতও। প্রিয়তমা কন্যা তেজস্বী দিবাকরের প্রেমে পাগল। একে কন্যা বিচ্ছেদের সময় আসন্ন তার ওপর কন্যা এমন একজনের কাছে নিজেকে সমর্পন করার জন্য উন্মুখ যার প্রখরতা সংজ্ঞা কি আদৌ সহ্য করতে পারবে? সূর্যের তেজে অঙ্গারে পরিণত হবে না তো তাঁর কোমলদেহী কন্যা? সমস্ত দ্বিধা ভুলে তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করেই ফেলেন, কেন দিবাকর? আর কি কোনও দেবতা সংজ্ঞার পাণিপার্থী হওয়ার যোগ্য

নয়? সংজ্ঞা দৃঢ় প্রতিবাদ করে ওঠে। পিতাকে আশ্বস্ত করে সে, বলে সূর্যও তাঁর প্রতি অনুরক্ত, সুতরাং তাঁর তেজে সংজ্ঞার কিছুই ক্ষতি হবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই বিশ্বকর্মাকে মেয়ের কথায় রাজি হতে হয়।

মহা ধুমধামের সঙ্গেই বিয়ে সাঙ্গ হয় সংজ্ঞা ও সূর্যের। দিন কাটে আনন্দে, উচ্ছ্বলতায়। জন্ম হয় দুই পুত্র মনু ও যম, কন্যা যমুনার। এই আনন্দ যজ্ঞে সূর্য হয়ে ওঠে আরও প্রখর, আরও অনেক বেশি প্রবল, তেজস্বী। আর তখনই সংজ্ঞার জীবনও হঠাৎ হয়ে উঠল অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রবল তেজস্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেবের কামনার আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। অন্যদিকে সংজ্ঞা অত মিলনে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। সংজ্ঞার মনে এই প্রশ্নই বারবার জাগতে লাগল, সূর্যদেব কি শুধু সংজ্ঞার দেহ পেতেই ইচ্ছুক? সূর্যদেবের তাঁর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছে হয়ত শুধুই প্রেমহীন মিলন? এরপর থেকে তাই সংজ্ঞা সূর্যদেবের সঙ্গে আলিঙ্গনে, মিলনে আনন্দ না পেয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতে থাকল।

এমনই একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে কামনাচ্ছুক দেব দিবাকরকে কঠোরভাবে ফিরিয়ে দিলেন সংজ্ঞা। ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল সংজ্ঞার মুখ। কঠোরভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার করল সংজ্ঞা, বলে উঠল, কামনা সুন্দর কিন্তু ইদানিং তা অসহ্য হয়ে উঠছে সংজ্ঞার কাছে।

সূর্য বোঝালেন, সংজ্ঞার প্রতি এই তীব্র কামনাবোধই সূর্যের প্রেম। সংজ্ঞা তা অস্বীকার করে বলে, সে একজন নারী, সূর্য সেই নারীত্বকে তাঁর তীব্র কামনা দিয়ে অপমান করছে। সংজ্ঞা হয়ে পড়ছে পীড়িত। ক্রুদ্ধ হলেন সূর্যদেব। তীব্র স্বরে স্ত্রীকে বললেন, যদি এই প্রেমকে সহ্য করতে না পারে সংজ্ঞা তবে এই প্রেমহীন পুরীতে থেকেই বা কী লাভ তাঁর? সূর্যও তাই এই অনুরাগহীন স্ত্রীকে আর নিজের কাছে রাখতে রাজি নয়।

সংজ্ঞা চমকে ওঠে স্বামীর এই সিদ্ধান্তে। অথচ নিজেও এই প্রেমহীন দেহসর্বস্ব সম্পর্ক রাখতে অনাগ্রহী। এটা যে কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের কাছে অসম্মানের, অপমানের। মনে মনে বাবার বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংজ্ঞা। যদিও মনের ভেতরে অসম্ভব দংশন হতে থাকে তাঁর, কোনও কি অন্যায় হচ্ছে তাঁর? কে দেখাবে সঠিক রাস্তা, পরামর্শই বা দেবে কে? ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের এক সরোবরের স্বচ্ছ জলে চোখ যায় তাঁর, নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই মুগ্ধ হয় সংজ্ঞা। মনে মনে কামনা করে জীবন্ত হোক তাঁর প্রতিবিম্ব। ওমনি প্রতিবিম্বটি জীবন্তরূপ পায়, অবাক হয় সংজ্ঞা নিজেও। প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?'

উত্তর আসে, 'আমি আপনার ছায়া মাত্র।'

সংজ্ঞা প্রতিবিম্বের নাম রাখে ছায়া, জিজ্ঞেস করে ছায়াকে, 'তুমি জান কেন আমার এই বিবেক দংশন? কেন আমি যেতে গিয়েও যেতে পারছি না?'

ছায়া উত্তর দেয়, 'স্বামীর প্রতি কর্তব্যচ্যুতির জন্যই এই বিবেকদংশন'। সংজ্ঞা প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, তাঁর স্বামী শুধুই কামনার দাস। তিনি সংজ্ঞার

সংজ্ঞা চমকে ওঠে স্বামীর এই সিদ্ধান্তে। অথচ নিজেও এই প্রেমহীন দেহসর্বস্ব সম্পর্ক রাখতে অনাগ্রহী। এটা যে কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের কাছে অসম্মানের, অপমানের। মনে মনে বাবার বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংজ্ঞা। যদিও মনের ভেতরে অসম্ভব দংশন হতে থাকে তাঁর, কোনও কি অন্যায় হচ্ছে তাঁর? কে দেখাবে সঠিক রাস্তা, পরামর্শই বা দেবে কে?

নারীত্বকে বারবার লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছেন। তাঁদের সন্তানও তাই হয়ত প্রেমহীন কামনারই ফসল।

ছায়া এর উত্তরে বলে ওঠে, স্বামীর সঙ্গে থাকাই পত্নীর ধর্ম, তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, তাঁর সেবা করাই পত্নীর ধর্ম হওয়া উচিৎ। এছাড়াও সূর্যদেব ও সংজ্ঞার সন্তানদের তো কোনও দোষ নেই, তাঁদের দুজনেরই রক্ত বইছে ওদের শরীরে। সংজ্ঞার কি আদৌ উচিৎ সন্তানদের ত্যাগ করা?

কথাগুলো শুনেই যন্ত্রনায় কাতর হয়ে উঠল সংজ্ঞা। সত্যি তো তাঁর অবর্তমানে কে সেবা করবে তাঁর স্বামীর? ব্যথিত হয়ে সে ছায়াকে এর প্রতিকারের উপায় জানতে চায়। ছায়া উত্তর দেয়, ফিরে যাওয়াই একমাত্র প্রতিকার।

'—অসম্ভব! ফিরে যাওয়ার আর কোনও উপায় নেই।' চিৎকার করে বলে ওঠে সংজ্ঞা। অনেক চিন্তা ভাবনার পর সংজ্ঞা ছায়াকে জানায় উপায় একটা আছে, যেহেতু ছায়াই সংজ্ঞার প্রতিবিম্ব, তাই ছায়াই যাক সূর্যের কাছে। সেবা করুক স্বামীর, লালন পালন করুক সন্তানদের।

ছায়া রাজি হয় এবং সেই সঙ্গে এও জানায় যে সংসার ধর্ম পালন করতে হলে তাকেও তো গর্ভধারণ করতে হবে, তখন যদি নিজের সন্তানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে সূর্যদেবের অভিশাপের মুখে পড়ে, তখন কী হবে?

সংজ্ঞা আশ্বস্ত করে, তবে ছায়া সত্য প্রকাশ করতে পারবে। এরপর দিন কাটে। সংজ্ঞারূপী ছায়া সূর্যের সেবা করে কয়েকটি সন্তানও লাভ করে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই ছায়ার অসত্য সবার কাছে ধরা পড়ে যায়। সূর্য-সংজ্ঞা পুত্র যম পিতার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, এই মা তাঁদের আসল মা নন। কারণ হিসেবে জানা যায়, প্রথম তিন সন্তানবাদে আর সবাইকে মা খুব স্নেহ করেন। চমকে উঠলেন দেব দিবাকর। সত্যিই তো চলে যাওয়ার পর মুহূর্তে ফিরে আসা সংজ্ঞার মধ্যে সমর্পণ দেখেছিলেন তিনি। অন্যরকম লাগছিল নিজের স্ত্রীকে।

তবে কি এই নারী অন্য কেউ? ক্রোধে লেলিহান হয়ে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কী তাঁর আসল পরিচয়। ছায়া জানত যে এমন দিন আসবেই। তাই সে সব সত্য প্রকাশ করে দিল সূর্যদেবের সামনে। স্ত্রীকে দেওয়া ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলেন তিনি। সংজ্ঞা পিত্রালয়ে আছে শুনে রথে চড়ে মহাস্থপতি বিশ্বকর্মার গৃহে যাত্রা করলেন তিনি। কিন্তু এসে নিরাশ হলেন তিনি। না, সংজ্ঞা নেই। বহুকাল পূর্বেই সে গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ।

চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলেন তিনি, সুবিধের জন্য ঘোটকের রূপ ধারণ করলেন। ইতিমধ্যে এক ঘোটককে তাঁর দিকে দুরন্ত গতিতে আসতে দেখে ভয় পেল সংজ্ঞা। করজোরে বলল, 'আমার স্বামী জীবিত, দয়া করে আমার ধর্ম নষ্ট করবেন না।'

ছদ্মবেশী সূর্যদেব মিলনের প্রস্তাব রাখলেন সংজ্ঞার সামনে। ক্রুদ্ধ সংজ্ঞা জানালেন এই পাপ কাজ করলে সংজ্ঞা তাঁর স্বামীকে আহ্বান করবেন। ঘোটকরূপী সূর্যদেব বললেন, 'কে তোমার স্বামী? আহ্বান করো তাঁকে?'

দ্বিধাগ্রস্থ সংজ্ঞা তখন কী করবে ভেবে পায় না। ঘোটকটি অগ্রসর হয় তাঁর দিকে। সংজ্ঞা দিশা না পেয়ে ডেকে ওঠে, 'স্বামী আমাকে রক্ষা করুন।'

অমনি আলোক বন্যায় ভরে উঠল চারদিক। সংজ্ঞা অবাক হয়ে দেখল ঘোটকের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর তেজস্বী স্বামী।

দুজন দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইলেন, সূর্যদেব বললেন, তিনি বুঝেছেন নারী শরীরই সব নয়। নারীত্বকে স্পর্শ করাই আসল মিলন। তিনি সংজ্ঞাকে সূর্যলোকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। সংজ্ঞা অনুরোধ করল ছায়াও থাকুক ওদের সঙ্গে, সূর্যের গৃহিণী হয়ে।

সূর্যের সপ্তাশ্বে চড়ে এরপর সকলেই সূর্যালোকে চলে গেলেন, আর সংজ্ঞা হয়ে উঠল অমর এক চরিত্র।

জলশহরে জলতরঙ্গের সুর আজও ভেসে আসে বর্ষা এলেই

'ডুয়ার্স' এই মোহময়ী শব্দটি যখনই মস্তিষ্কের কোষগুলিতে অনুরণিত হয় তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ, কানে বেজে ওঠে উপলমুখর ঝরনার মূর্ছনা, নাকে ভেসে আসে সতেজ চা-পাতার সুবাস, আর বুকের আনাচ-কানাচ ভরে ওঠে এক অনন্য ভাল লাগায় ও এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে। এই সুন্দরী ডুয়ার্সের এক ছোট মফঃস্বল শহর জলপাইগুড়িতে আমার জন্ম। তাই আমার মেয়েবেলা এবং আমার একটু একটু করে বড়বেলার দিকে এগিয়ে যাওয়া— সবটাই এই ডুয়ার্সের কোলে। বাড়ির গুরুজনদের কাছে শুনেছি, স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের ঢাকা জেলা থেকে এসে আমার ঠাকুর্দা গ্রাসমোড় চা-বাগানে চাকরি নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে আমার বাবা কাকাদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে জলপাইগুড়িতে একটি বসত বাড়িও তৈরি করেন। সেই থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ডুয়ার্সের নিবিড় যোগসূত্র তৈরি হওয়া।

টিনের চাল, ইঁটের গাঁথনি আর কাঠের সিলিং দেওয়া ঠাকুর্দার তৈরি ওই বাড়ির গঠনরীতি ছিল তদানীন্তন জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্সের প্রায় বেশিরভাগ বাড়িরই গড়ন বৈশিষ্ট্য। তখনকার দিনে পাকা ছাদওয়ালা বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে কমই চোখে পড়ত। তার মূল কারণ ছিল ডুয়ার্সের একটানা বর্ষা। আজও মনে পড়ে, ছোটবেলায় জুন-জুলাই মাসে একটানা উনিশ-কুড়িদিন আমারা সূর্যদেবের দেখাই পেতাম না। ছাই রঙের গোমড়া আকাশ, জল থৈ থৈ পথঘাট, মাথার ওপর অবিরাম রিমঝিম আর ব্যাঙেদের একটানা কনসার্ট— এই ছিল ডুয়ার্সের বর্ষা। সেই দিনগুলোতে স্কুলে প্রায়ই ভিজে চুপচুপে হয়ে পৌঁছতাম। আর তারপরেই পেতাম কাঙ্ক্ষিত 'রেইনি ডে'-র ছুটি। ফেরার সময় আবারও একপ্রস্থ ভেজার পালা। বাড়ি ফিরে কাগজের নৌকো বানিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় (যেটা সেসময় ছোটখাটো নদীতে পরিণত হত) ছেড়ে দেওয়া ছিল ছেলেবেলার সমস্ত স্মৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি উল্লেখযোগ্য আনন্দের মুহূর্ত। শুধু নৌকো ভাসিয়েই কাজ শেষ হত না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ ধরে দেখতাম সেই নৌকোর গতিপথ। ঠিকঠাক ভাসতে ভাসতে আমার নিজের হাতের গন্ধ মাখানো সেই ছোট্ট ডিঙি অজানা কোথাও চলে গেল নাকি একটু গিয়েই ভিজে নেতিয়ে গেল জলে। ডুবে গেলে মন খারাপ হত বৈকি।

সন্ধের পর খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হলে বিদ্যুৎ না থাকাটা খুব স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ত। খুব মনে পড়ে লন্ঠন কিংবা মোমবাতি জ্বেলে পড়তে বসার কথা। তাড়াতাড়ি পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে

শ্রুতি দত্ত রায়

শুধু জল শহর নয়, আমার মেয়েবেলার বেশ কিছু সময় কেটেছে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন চা-বাগানগুলিতে। শুধু ঠাকুর্দাই নন, আমার জ্যেঠু, পিসতুতো বেশ কয়েকজন দাদা, পিসেমশাই ডুয়ার্সের টি বেল্টে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন। আজও আমার স্মৃতিতে তাই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সেইসব বাগান— কলাবাড়ি, বানারহাট, গাঠিয়া বা বড়দিঘি। তখন ডুয়ার্সের চা-বাগান ছিল যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ তেমনি নির্মল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার। আমার মেজো পিসেমশাই ছিলেন কলাবাড়ি চা-বাগানের ইঞ্জিনীয়ার। দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি কেমন করে, কোন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের রূপ-রস-গন্ধের প্রাচুর্য নিয়ে চা পিয়াসীদের মন ভরায়, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল পিসেমশাইয়ের হাত ধরে।

মায়ের কাছে আবদার করতাম লুডো খেলার। মাকেও দেখতাম, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে হাসিমুখে আমাকে নিয়ে লুডো খেলতে বসতেন। লন্ঠনের আলো-আঁধারিতে, খিচুড়ির গন্ধে আর টিনের চালের একটানা জলতরঙ্গের টুংটাং আওয়াজে এক সরল ভাললাগায় মন ভরে উঠত। সেই সময় বাবাকে দেখতাম অন্ধকারে বসে রেডিওতে খবর শুনতেন। ডুয়ার্সের কোন কোন নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর শোনা চাই। কানে ভেসে আসত জলঢাকা, তিস্তা, তোর্সা, লিশ, ঘিস এইসব নদীদের নাম। এদের সঙ্গে এভাবেই আমার পরিচয়। তখন 'যুগান্তর' বা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ট্রেনে চেপে একদিন পরে ডুয়ার্সের ঘরে ঘরে এসে পৌঁছাত। কাজেই রেডিওই ছিল টাটকা খবর পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। তিস্তার জল বিপদসীমার কাছাকাছি আসা বা নদীতে হলুদ সংকেত দেখানোর খবর একবার রটে গেলে জলশহরের প্রচুর মানুষ ছুটত নদীর জল দেখতে। শহর সংলগ্ন তিস্তার স্পারে তখন যেন মেলা বসত। সম্ভাব্য বন্যার আশংকায় মানুষজন যেমন একদিকে ভয় পেত, তেমনি নদীর পাক খাওয়া ঘোলা জলের নাচ দেখতে গিয়ে কম রোমাঞ্চিতও হত না।

শুধু জল শহর নয়, আমার মেয়েবেলার বেশ কিছু সময় কেটেছে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন চা-বাগানগুলিতে। শুধু ঠাকুর্দাই নন, আমার জ্যেঠু, পিসতুতো বেশ কয়েকজন দাদা, পিসেমশাই ডুয়ার্সের টি বেল্টে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন। আজও আমার স্মৃতিতে তাই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সেইসব বাগান— কলাবাড়ি, বানারহাট, গাঠিয়া বা বড়দিঘি ইত্যাদি। তখন ডুয়ার্সের চা-বাগান ছিল যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ তেমনি নির্মল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার। আমার মেজো পিসেমশাই ছিলেন কলাবাড়ি চা-বাগানের ইঞ্জিনীয়ার। দুটো পাতা আর একটা কুঁড়ি কেমন করে, কোন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের রূপ-রস-গন্ধের প্রাচুর্য নিয়ে চা পিয়াসীদের মন ভরায়, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই পিসেমশাইয়ের হাত ধরে এই কলাবাড়ি বাগানের অন্দরমহলেই। বাগানের কোয়ার্টারগুলো ছিল বাংলো প্যাটার্নের। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির উপর কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি হত সেইসব বাংলো। বন্যা বা অতিবৃষ্টির জল এবং বুনো হাতির কবল থেকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যেই এভাবে বাড়িগুলো বানানো। সামনের দিকে থাকত কাঠের সিঁড়ি।

পিসেমশাইকে সবাই 'কলবাবু' বলে ডাকত। এটাই ছিল দস্তুর। 'গুদামবাবু', 'বড়বাবু', 'কলবাবু', 'ফিটারবাবু', 'ফ্যাক্টরিবাবু', 'ম্যানেজারবাবু', এগুলোই ছিল কর্মচারিদের একে অন্যেকে ডাকার রেওয়াজ। এতে সম্মানের সঙ্গে আন্তরিকতার সুর থাকত জড়িয়ে। বাংলোগুলোকে ঘিরে থাকত সবজি আর ফলের বাগান। আমার ছোটবেলা কেটেছে

যৌথ পরিবারের পরিমন্ডলে। তখন দেখতাম, যখনই জ্যেঠু, পিসি বা দাদারা শহরের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন সঙ্গে করে আনতেন বাগানের লিচু, বেল, চা-পাতা, সবজি এমনকি গরুর খাঁটি দুধের টাটকা ক্ষীর।

আমার ছোটবেলায় মানুষের ভেতর এত ব্যস্ততা দেখিনি আজ যেমন দেখি। টিভি থাকলেও তাতে এত চ্যানেল ছিল না। বিনোদন বলতে ছিল বিভিন্ন নাচ-গান-নাটকের অনুষ্ঠান দেখা কিংবা সিনেমায় যাওয়া। ফলে অনেক সময়েই সারারাত ধরে গানের অনুষ্ঠান হতে দেখা যেত, বড় বড় শিল্পীরা আসতেন তাঁদের শিল্পের উপহার নিয়ে। ভিড় উপচে পড়ত রবীন্দ্রভবনে। আজকাল কলকাতায় যাওয়া যতটা সহজ তখন ঠিক ততটা ছিল না। ফলে বড় মাপের শিল্পীদের শহরে দেখার সুবিধে পেলে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা কোনওমতেই সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইত না। এভাবেই আমারও সুযোগ হয়েছিল মমতাশংকর-তনুশ্রীশংকর ব্যালে ট্রুপের ‘চন্ডালিকা’ দেখার, শোনার সুযোগ হয়েছিল ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের গান। বাবা-মায়ের সঙ্গে কতদিন যে কলকাতা থেকে আসা নাট্যদলের নাটক দেখেছি তার হিসেব নেই। আমার বাবা ছিলেন জলপাইগুড়ি সিনে সোসাইটির সদস্য। ফলে ‘বান্ধ্যবনাট্য সমাজ’ তথা ‘দীপ্তি টকিজ’-এ একদিকে যেমন দেখার সুযোগ হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ তেমনি আবার চার্লি চ্যাপলিনের ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’। আসলে ছোটবেলার অনেক সামান্য ঘটনাও মনের ভেতর এমনভাবে বাসা বাঁধে যে তা সারাজীবন অনেক ভাল এবং বড় ঘটনার স্মৃতিকেও হার মানায়।

টিভি যেহেতু ততটা জায়গা তখনও পর্যন্ত দখল করেনি তাই পুরোটা জুড়েই ছিল রেডিওর জনপ্রিয়তা। আমার বাবা নিজের হাতে একটি রেডিওগ্রাম (রেডিও ও গ্রামাফোন) বানিয়েছিলেন। মা সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সেটাতে ‘আকাশবাণী শিলিগুড়ি’ চালু করে দিতেন। সকাল সাতটায় ‘প্রত্যুষা’, তারপর একে একে নজরুলগীতির অনুষ্ঠান, খবর, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে বেজে চলত। রবিবারের সকালে শুনতাম ‘শিশুমহল’ আর দুপুরে মাংসভাতের সঙ্গে বাজত ছায়াছবির গানের অনুরোধের আসর। জম্পেশ করে খাওয়া-দাওয়া সারা হলে শুরু হত বেতার নাটক। বাবা ভাল ফুটবলার ছিলেন। ফলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার ধারাবিবরণী থাকলে সারাটা দিন সম্পূর্ণ খেলার ভাষ্য শোনা ছিল বাবার নেশার মত।

আজও, এই বড়বেলায় যখন জলশহরে বর্ষা নামে আর আমার পৈতৃক ভিটের টিনের চালে বেজে ওঠে জলতরঙ্গের সুর, মনে পড়ে যায় মেয়েবেলার সেই সবুজ দিনগুলির কথা। কখনও বা সুদূর অতীত থেকে ভেসে আসে সেই ধারাভাষ্যের উত্তেজনাপূর্ণ কন্ঠের ওঠানামা। কখনও বা বাবার প্রাণখোলা দরদী গলায় গাওয়া আব্বাসউদ্দিনের ভাওয়াইয়া— “তোর্সা নদীর উথালপাথাল কার বা চলে নাও, সোনা বন্ধুর বাদে রে মন কেমন করে গাও রে-”। তোর্সা নদীর গান শুনতে শুনতে আমার বুকেও তখন বেজে ওঠে তিস্তার ছলাৎ ছল। মন খারাপের কুয়াশারা ভিড় করে আসে, স্মৃতির নদীতে ওঠে ছোট ছোট ঢেউ। চার দেওয়ালের নির্জনতায় আমি খুঁজে পাই আমার ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া নিষ্পাপ ডুয়ার্সকে।

রাসায়নিক রস

দৈব মহিলা মজলিস

শিব ঠাকুর: (কল্কে টেনে) হু হু সসসসসসস্, ভু উ উ উ সসসস্! মা বোনেরা! এবার আপনাদের আসর শুরু করুন।

পার্বতী: মা-বোন মানে? আমিও তো আছি।

সরস্বতী: বাবা আমাকে মা বলল না বোন বলল?

লক্ষ্মী: চুপ! মনসা বক্তব্য রাখছে।

মনসা: বক্তব্য রাখার কিচ্ছু নেই। মর্ত্যে মেয়েরা দুটো বিড়ি টেনেছে, হাফ প্যান্ট পরেছে — একেবারে গেল গেল রব!

কালী: আমায় একবার বলে দেখুক। মুন্ডু কেটে লকেট বানাব।

জটিলা: মেয়েদের বাড়তে দেখে মুখপোড়াদের এত জ্বলচে ক্যানো লা?

চন্ডী: অসুর বধের বেলায় কিন্তু আমাদেরই আসতে হয়। আজ পর্যন্ত ছেলেগুলো কটা অসুর মেরেছে?

পার্বতী: ছাড় তো! আমরা আমাদের কাজ দশ হাতে করব। — তা হ্যাঁ রে কালী! তোর পুজো কেমন হল?

কালী: কী পলিটিক্স কী পলিটিক্স মা! মনে হচ্ছিল সব কটার বুকের ওপর উঠে নাচি।

মনসা: নাচলেই পারতিস।

কালী: ওমা! ছেলেগুলো না থাকলে আমাদের পুজো করবে কে? মাঝে মাঝে ওদের ওপর রাগ হয় ঠিকই। কিন্তু অমন জাঁকজমক করে যখন পুজো করে, তখন আবার সব ভুলে যাই।

রাধা: (স্বগতোক্তি) তুমি আর কী বুঝবে কালী! সে তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি।

জটিলা: পলিটিক্সের কথা কী জানি বলছিলি?

কালী: আর বলো না! ছোট ফুল, বড় ফুল এমন কি কাস্তে হাতুড়িও আমায় চাইছিল। গোড়ায় বুকের ওপর নাচতে ইচ্ছে করলেও পরে মনে হল, ইশ! আমার কি কদর! আমি সেলিব্রিটি!

চন্ডী: হ্যাঁ রে কেলো! তোর হল কী?

সরস্বতী: কী আর হবে। কালীদি ইমেজ বদলাচ্ছে।

লক্ষ্মী: বয়ফ্রেন্ড পেলে নাকি কালীদি?

রাধা: হায়! কালীদির হবে বয়ফ্রেন্ড! সবাই তো ‘মা ’ বলতে অজ্ঞান!

সরস্বতী: আমার কিন্তু মর্ত্যে প্র-চু উ র ফ্যান।

মনসা: আমাকে দেখলে তো সবাই এন্টি ভেনম খুঁজে বেড়ায়।

চন্ডী: ঠিক বলেছিস সরো! কী সব ইমেজ আমাদের! রক্তখেকো, কাটামুন্ড শোভিত নেকলেসধারিনী, করালমুখী! এসব বদলাতে হবে।

পার্বতী: কী কান্ড! তোরা মর্ত্যে গিয়ে বিড়ি খাবি, গাঁজা খাবি, মাতাল হবি মনে হচ্ছে! হাফ প্যান্ট পরবি নাকি?

মনসা: (উত্তেজিত) বেশ করব! মানুষ যা মর্ত্যে করে আমরাও তাই করব! প্যান্ডেলে লেগিস পরে বাঁ হাতে সাপ ডান হাতে সিগারেট নিয়ে দাঁড়াব!

জটিলা: তবে মন্ত্র নতুন করে লিখতে হবে লা।

লক্ষ্মী: আমার কোনও লাভ নেই। আমাকে বায়োমেট্রিক চাবি দেওয়া লকারে রেখে দেবে।

পার্বতী: মর্ত্য পুরুষদের এখনো চিনিস নি। কেবল মুখেই মা-মা, বোন-বোন করবে। যে হাতে পুজো দেয় সে হাতেই অপমান করে।

কালী: একবার করে দেখুক!

চন্ডী: চার হাতে গলা টিপে ধরব।

রাধা: পারবি নে পারবি নে! আমি কি পেরেছিলাম!

মনসা: আমাদের এখানে ফেমিনিজিম্ চাই। ইন্দ্র ব্যাটাকে কেউ পুজো করে না! ব্যাটা দেবরাজ হয় কী ভাবে?

সরস্বতী: জামাইবাবু তো রাতদি ক্ষীরোদ সাগরে ঘুমোয়।

লক্ষ্মী: এই! আমার বরকে নিয়ে কিছু বলবি না বলে দিলাম!

কালী: ফেমিনিজিম্ কথাটা মন্দ বলিস নি মনসা!

(রামের প্রবেশ)

রাম: সে কী! আজ কৈলাসে আপনাদের মহিলা মজলিস বসেছে নাকি?

সরস্বতী: জয় শ্রীরাম! তুমি ভুল সময় এসে পড়েছ দাদা!

রাম: কেন?

সরস্বতী: ফেমিনিজিম্ চলছে।

চন্ডী: এই রামা! শোন এদিকে!

রাম: পেন্নাম চন্ডীমাতা!

চন্ডী: পেন্নাম টেন্নাম রাখো। তোমায় পস্ট করে একটা কথা বলে দিচ্ছি। সারা বছর আমরা অসুর মারব আর লোকে তোমার নামে ধ্বনি দেব এসব চলবে না।

রাম: ইয়ে মানে — আমার একটু তাড়া আছে।

কালী: দাঁড়া! আমাদের কথাটা বুঝতে পেরেছিস?

রাম: (পলায়ন পূর্বক) বিলক্ষণ! আমার বদলে সীতা হলে চলবে? জয় শ্রীসীতা?

সরস্বতী: ব্যাকরণে ভুল। জয় শ্রীমতি সীতা হবে।

দেবীরা: (সমবেত স্বরে) জয় শ্রীমতী সীতা!!

শিব ঠাকুর: হু উ উ সসসস্! প্রলয় আসন্ন! ভু উ উ উ সসসস্!

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

এখন ডুয়ার্স সাহিত্য সন্ধ্যা

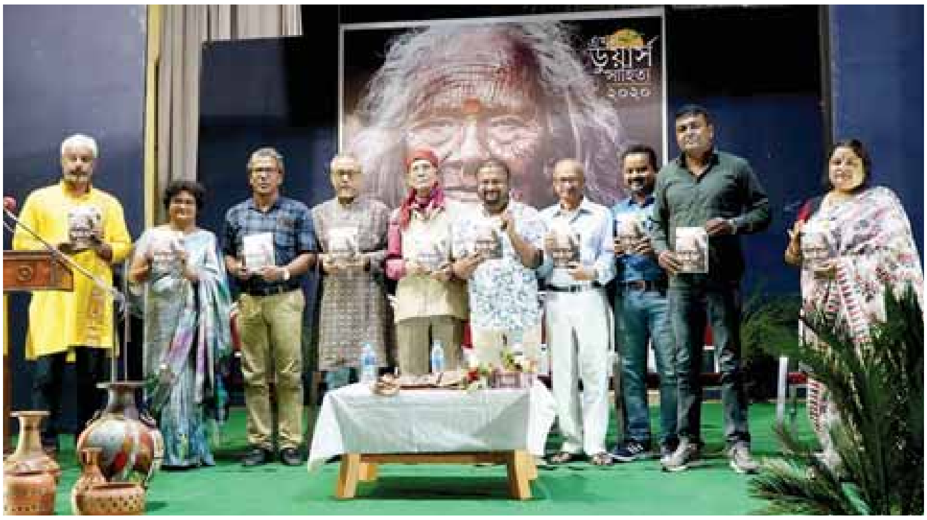

১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় "প্রয়াস" মঞ্চে "এখন ডুয়ার্স সাহিত্য সংকলন ২০২০"-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

এত বড় সাহিত্যকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান শেষ কবে দেখেছিল জলপাইগুড়ি?

এমনই প্রশ্ন তুলেছিলেন জল শহরের প্রবীণ সাহিত্য অনুরাগীরা।

১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় "প্রয়াস" মঞ্চে "এখন ডুয়ার্স সাহিত্য সংকলন ২০২০"-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশকে ঘিরে দিনহাটা থেকে শুরু করে দুই দিনাজপুর, এদিন অভ্যাগতদের বিস্তার ছিল চোখে পড়বার মতই।

উত্তরের বইপ্রেমী মানুষজন খুশি হয়েছেন। কারণ একটি ৫১২ পৃষ্ঠার সংকলন ছাড়াও এদিন তাঁরা পেয়েছেন একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠ। আলোচনায় অংশ নেন তপন রায় প্রধান, অমিত কুমার দে ও সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। জলপাইগুড়ির দুই প্রবীণ, গবেষক ডঃ বিমলেন্দু মজুমদার ও গল্পকার শ্রী অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মাননা জানাতে পেরে 'এখন ডুয়ার্স' আনন্দিত।

আর একক কবিতা পাঠে কবি সুজিত দাস ছিলেন অনন্য। সুজিত দাস প্রমাণ করেছেন যে তাঁকে স্বীকার করার মত সহর্ষ শ্রোতার অভাব নেই।

নিজস্ব প্রতিবেদন

তপন রায় প্রধান

অমিত কুমার দে

সুজিত দাস

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

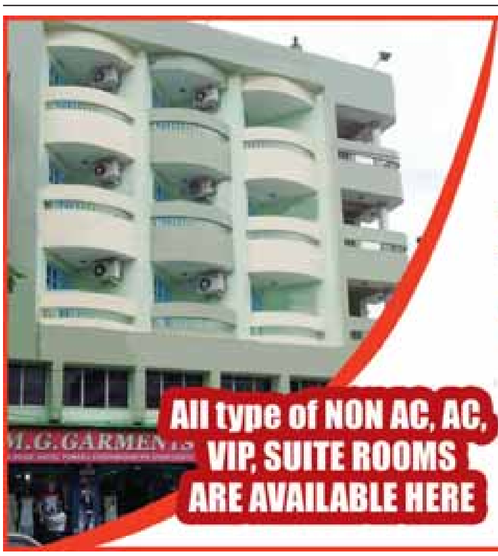

WEL COME
HOTEL YUBRAJ
&
RESTAURANT MONARCH
CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR
CONTACT NO.
+91 9735526252, (03582) 227885
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.